

কবিতা শ্রীরামপুর

সম্পাদনা

শৈলেনকুমার দত্ত | মৃদুল দাশগুপ্ত | রামকিশোর ভট্টাচার্য



কবিতা, শ্রীরামপুর

সম্পাদনা

শৈলেনকুমার দত্ত মৃদুল দাশগুপ্ত রামকিশোর ভট্টাচার্য



KABITA, SHRIRAMPUR

A Collection of Poems

Edited by

Sailen Kumar Datta, Mridul Dasgupta, Ramkishore Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০২০

ISBN : 978-93-88341-13-4

প্রচ্ছদ : কাননদেব ভট্টাচার্য

(প্রচ্ছদ—লিপিতে পঞ্চানন কর্মকারের হরফ ব্যবহৃত)

বর্ণ সংস্থাপন : অরিন্দম দাশগুপ্ত

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশই
কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক
উপায়ের (গ্রাফিকস, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি,
টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি)
মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড
মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংস্করণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে
পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে
উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : গৌতম দাশ

পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন,

কলকাতা ৭০০ ০০৯ (৯৯০৩০ ৯১২২৫) থেকে প্রকাশিত এবং

সারপাস এন্টারপ্রাইজ, ৫৩এ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

e-mail : parampara13@gmail.com

প্রথম প্রকাশিত 'কবিতা, শ্রীরামপুর'—এর যেসব কবিদের আমরা হারিয়েছি
সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, কেশব বণিক, মুকুল বসু, প্রদীপ দাস,
অদ্রীশ বিশ্বাস, দেব গঙ্গোপাধ্যায় (নিরুদ্দেশ)
এঁদের সুমধুর স্মৃতিতে

ভূমিকায় দু'চার কথা

২৫ বছর আগের কথা। ১৯৯৫ সাল। পৌরসভায় চাকরির সুবাদে শ্রীরামপুরের প্রায় সব ক্ষেত্রের মানুষজনের আসা যাওয়া ছিল। সেইরূপ সোমনাথদা— কবি সোমনাথ মুখোপাধ্যায় আসত প্রায়। লোকজনের ভিড় কমলে চলত কবিতা নিয়ে কথা, আলোচনা। সেই সূত্রেই কথায় কথায় শ্রীরামপুরের কবিদের কথা। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই মনে হল শ্রীরামপুরের কবিদের কবিতা সংকলন বার করার কথা। তখন শ্রীরামপুরের অগ্রজ কবি শৈলেনদা ও মৃদুলের সঙ্গে আলোচনা শুরু। আর এক কবি সমরদার (সমর বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে শৈলেনদার বাড়িতে প্রায় চায়ের আড্ডায় মকশো করা হল। স্থির হল পৌরসভার ঘেরাটোপের মধ্যের কবিদের নিয়ে সংকলন হবে। নামও ঠিক হল। 'কবিতা, শ্রীরামপুর'। প্রথম প্রকাশের জন্য তিনজন কবি শৈলেনদা, সোমনাথদা, মৃদুলের সম্পাদনায় এবং উৎসাহে 'কবিতা পাক্ষিক' প্রকাশনা থেকে 'কবিতা, শ্রীরামপুর'। ২৫ বছর পরে আবার ভাবনা শুরু দ্বিতীয় সংকলনের। কিন্তু মুশকিল হল সোমনাথদার মৃত্যু এবং সমরদার মতো মাপের কবির অনুপস্থিতি। অগত্যা বহুদিনের পরিচিত শ্রীরামপুরের স্বনামধন্য কবি রামকিশোরের কাছে কথাটা বললাম এবং অনুরোধ করলাম দ্বিতীয় সংকলনের ভার নেওয়ার জন্য। রামকিশোর এককথায় রাজি। শৈলেনদা, মৃদুল ও রামকিশোরের বিশেষ চেষ্টায় ও সম্পাদনায় 'কবিতা, শ্রীরামপুর'—এর দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হল 'পরম্পরা' প্রকাশনা থেকে। এবার সকল কবি ও সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে অনুরোধ শ্রীরামপুরের সুনামের জন্য শ্রীরামপুরের কবিদের যে অবদান তা মনে রেখে তৃতীয় সংকলন প্রকাশের যেন বিলম্ব না হয়।

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

কলকাতা নগরীর তখন তিনশ বছর উদযাপন হচ্ছে। সে—সময় হাওড়া শহরের কিছু রসিক মানুষ এক কাল্পনিক প্রসঙ্গে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। জোব চার্নকের ডিঙি যদি হুগলি নদীর ওপারে না ভিড়ে এপারে ভিড়ত, তাহলে হাওড়া শহর কী রূপ লাভ করতে পারত—সেই কল্পনা নিয়ে বিভোর হয়ে ওঠেন।

এই সময় হাওড়া শহর থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি ছোটো শহর সম্ভবত উদাস হয়ে ওঠে! কেন না, তার ইতিহাস বহু প্রাচীন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব যে মাহেশের রথের রশি টেনেছিলেন, তাও তো ছ'শ বাইশ বছর পেরিয়ে গেল!

এ শহরে রামমোহনের মামার বাড়ি আছে, সেখানেই তাঁর জন্ম। এ নিয়ে মহাকালের একটি নিপুণ রসিকতা আছে। রামমোহনের জন্ম শ্রীরামপুরে, মৃত্যু ইংলন্ডে আর উইলিয়ম কেরির জন্ম ইংলন্ডে, মৃত্যু শ্রীরামপুরে। শহর শ্রীরামপুর নিয়ে বাংলা গদ্যের দুই কালজয়ী শিল্পীর জন্ম—মৃত্যুর এই যোগাযোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ!

আরও আছে। এশিয়ার দ্বিতীয় প্রাচীনতম শ্রীরামপুর কলেজের দ্বিশতবর্ষ সদ্য উদযাপিত হয়েছে। এই শহরে বসেই পঞ্চানন কর্মকার বাংলা হরফ নির্মাণ করেন, আর তাই নিয়ে উইলিয়ম কেরি শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ের সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থপ্রকাশ তো নয়, যেন এক একটি বিস্ফোরণ! আর এসব কর্মকাণ্ডের প্রায় কুড়ি বছর পরে বিদ্যাসাগরের জন্ম, চব্বিশ বছর পরে মধুসূদনের, আর বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম আটত্রিশ বছর পরে। রবীন্দ্রনাথ তো আরও অনেক পরে। ভাবা যায়!

এহেন গৌরবমণ্ডিত শহরের অধিবাসীদের গর্ব তো হবেই। দিনেমাররা এ শহরের নাম ফ্রেডরিক নগর দিলেও, শ্রীরামপুরবাসী এ শহরকে 'অক্ষর শহর' কিংবা 'হরফ নগর' বলে ভাবতে বেশি গর্ববোধ করেন।

এই শহরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খ্যাতিমান কবি অমিয় চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং হরপ্রসাদ মিত্রের জন্মশতবার্ষিকী ধরলে, এ শহরের কাব্যচর্চাও তো সুদীর্ঘদিনের। সেটাও কম গর্বের কথা নয়!

শ্রীরামপুর পৌরসভার চৌহদ্দিতে বসবাসকারী কবিদের কবিতা নিয়ে 'কবিতা শ্রীরামপুর' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে, এবার পরবর্তী আরও তরুণ কবিদের গর্বিত পরিক্রমা নিয়ে প্রকাশিত হল কবিতা শ্রীরামপুর—দুই। নির্ধারিত এলাকার সমস্ত কবিদের আমরা গ্রন্থভুক্ত করতে পারিনি। তার একটা কারণ যেমন যোগাযোগের অভাব—অন্য কারণ তেমনি ভিন্ন ধারার কাব্যচর্চা। সীমিত আয়তনের জন্যেও অনেক ভালো কবিতা দেওয়া গেল না। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

আর একটি কথা। এ গ্রন্থের সমস্ত ব্যয়ভার এবং আগ্রহ যিনি একটানা বহন করে গেছেন, সেই কবিতাপ্রেমিক নিঃস্বার্থ মানুষটির নাম উল্লেখ করতেও তাঁর আপত্তি। তিনি হলেন ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়।

তাকে ধন্যবাদ জানানোর দুঃসাহসও আমাদের কারোর নেই! শুভেচ্ছান্তে—

শৈলেনকুমার দত্ত, মৃদুল দাশগুপ্ত ও রামকিশোর ভট্টাচার্য

'কবিতা শ্রীরামপুর'—প্রথম সংকলন (১৯৯৫) সম্পর্কে
সমসাময়িক পত্র—পত্রিকার মতামত

দেশ

১০ অগাস্ট ১৯৯৬

কাব্য সংকলন হিসাবে 'কবিতা, শ্রীরামপুর' বাংলা কবিতায় এক নতুন সংযোজন। কবিতা পাক্ষিক প্রকাশিত এই অভিনব সংকলনে আছে শ্রীরামপুর শহরের বর্তমান ও অতীতের বাসিন্দা আঠাশ জন কবির রচনা। অনেকের একটি, কয়েকজনের একাধিক। সংকলনটির সম্পাদকও তিন জন সুপরিচিত কবি যাঁদের কবিতা এই বইয়ে গ্রন্থিত। এক হিসেবে স্থানিক এই সংকলনটি বাংলার মফস্বলের কবিতার একটি নমুনা মাত্র। কিন্তু চাঁদের মাটি তুলে আনার চেয়ে অধিক যত্নে এই সংকলনের কবিতা নির্বাচন করায়, পড়ার সময় ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কথা মনে থাকে না। প্রকৃত কবিতার কোনও মফস্বলি বা নাগরিক চরিত্র নেই। এই কারণে চিত্রা লাহিড়ী, মৃদুল দাশগুপ্ত, রমা ঘোষ, রামকিশোর ভট্টাচার্য বা সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পড়ার সময় কবিতার শাস্ত্রত আবেদন আমাদের মুগ্ধ করে।

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাসে শ্রীরামপুরের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। এই শহরের ইতিহাস, ভূগোল, পরিবেশ, সমাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পাঠকপাঠিকা 'কবিতা, শ্রীরামপুর'—এর রচনার স্বাদ গ্রহণে আরও বেশি সফল হবেন, এ কথা অনস্বীকার্য। স্থানিক সংকলনের প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয় এই। পরিচিত কবিদের পাশাপাশি অপরিচিত অথচ জোরালো কলমে লেখেন শ্রীরামপুরের এমন অনেক কবির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা আলোচ্য কাব্য সংকলনটিকে আরও মূল্যবান করে তুলেছে। ১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরি প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের পঞ্চানন কর্মকার নির্মিত বাংলা হরফ দিয়ে মুদ্রিত প্রচ্ছদটি এই সংকলনের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে আরও।

কবিতা ডালাস

ফেব্রুয়ারি, ২০০০

ঢাকা বা কলকাতার বাইরে যাঁরা কবিতা লিখছেন, তাঁদের মধ্যে বঙ্গ ও বহির্বঙ্গের মফস্বল একটা বড়ো রকমের কণ্ঠস্বর যোজনা করে চলেছেন আজ বহুদিন হল। দম্ভ নয়, সমীচীন গর্ব নিয়েই ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবাংলার শ্রীরামপুর শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল অদ্ভুত একটি কবিতা সংকলন। হলুদ রঙের ঝকঝকে মলাটের ওপর গাঢ় কালো রঙের তুলির টানে, সিল্যুয়েটে, শ্রীরামপুরের নগরশীর্ষের ছবি আঁকা, নাম 'কবিতা, শ্রীরামপুর'। আনুমানিক পাঁচিশজন শ্রীরামপুরবাসী কবির একগুচ্ছ তাজা কবিতার সেই সংকলন পড়ে চমকে উঠতে হয়—কলেজ স্ট্রিটের সেই ইমেজ কি সত্যিই ভাঙতে চলল এইবার? কিংবা শাহবাগের চূড়ান্ত ঘোষণাগুলি?

উল্টোদিকে, কলেজ স্ট্রীট, শাহবাগ, আগরতলা, শ্রীরামপুর কিংবা শ্রীহট্টের প্রয়াগ থেকে বহুদূরে, প্রায় ভিন্ন এক গ্রহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস শহরে আমরা চারজন থাকি। জীবিকাসূত্রে অভিবাসী জীবনযাপন করি, আশংকা করেছিলাম দেশের মাটি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতার থেকেও বিদায় নিতে হবে একদিন। কিন্তু এটা লিখতে ভালো লাগছে যে, এখানেও এই ডায়স্পোরা— গুঞ্জরিত অকূল আঁধারেও, আমাদের একজন প্রিয় কবির ভাষায় আমরাও দেখছি কেবল লাল বাংলাভাষা আর নীল বাংলাভাষা আর হলুদ সবুজ বাংলাভাষা...।

আজকাল

৩ মার্চ ১৯৯৬

কবিতা, শ্রীরামপুর p সম্পাদনা : শৈলেনকুমার দত্ত, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়,

মৃদুল দাশগুপ্ত p কবিতা পাক্ষিক p ২৫ টাকা

শ্রীরামপুরের পৌরসীমানার মধ্যেই যাঁরা বাস করেন অথবা করতেন, এমন ২৮ জন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে 'কবিতা, শ্রীরামপুর' গ্রন্থে। কবিতায় ব্যক্তিগতের যতটা মর্যাদা, স্থানিকের আদৌ তা নয়। একেবারেই স্থানিক এই সংকলনটির কবিতাগুলির ভেতরেও কোথাও নেই ওই পৌরসীমার কোনও নামগন্ধ। অথচ এই সংকলন। যেন ভারি মলাট ওল্টানোর পরই যে কৌতূহল—জাগানো ভূমিকা, তা থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হতে থাকে কবিতাগুলি, যত পাতা ওল্টাই, ততই। যে তিনজন এই সংকলনের সম্পাদক, তাঁদেরও কবিতা রয়েছে সংকলনে। যে অহঙ্কার তাঁদের কাব্যভাষায় জড়িয়ে, তার সিকিমাত্রও নেই 'ছোট ছোট ঢেউ' শীর্ষক ভূমিকার চিন্তাবিন্যাসে। 'কবিতা, শ্রীরামপুর'—এর কবিতা অংশটুকুই তাই পাঠকের কাছে দ্রুত পৌঁছয়, শ্রীরামপুরের চেয়ে। বা বলা ভাল, পাঠকই দ্রুত পৌঁছে যেতে পারেন কবিতার কাছে। গতিময় অন্য যে—কোনও মাধ্যমের চেয়ে কবিতার এই দ্রুতগতির কথা, বিচিত্রগামিতার কথা সম্পাদকদের জানা ছিল কিনা, সেই তর্কে ফেঁসে যাওয়া অর্থহীন। নানা বয়সের যে আঠাশজনের কবিতা এই সংকলনে রয়েছে, তাঁদের কেউ কেউ তো পরিচয়ের অন্য সামাজিকতায় ইতিমধ্যেই বিশিষ্ট। এই সংকলন এক অন্য অবকাশ ও আড়াল দেয়, তাঁদের কবিতাকে, সেই কবিতার পাঠকে। তাই দেখি অকপট পণ্ডিত 'আমি একজন মানুষএটা কি যথেষ্ট নয়?কে তুমি?' (অসীমেশ গোস্বামী)। বা 'যতটা ছড়াব আমি, তাই হবে জননীর সীমা' (শৈলেনকুমার দত্ত)। কবিতার নিবিষ্টতায় কাছে টেনে নেন 'কবিতা, শ্রীরামপুর'—এর অধিকাংশ কবিই। তরুণতম শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রবীণ কেশব বণিক পর্যন্ত। সেই নিবিষ্টতায় যতই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শ্রীরামপুরের কবিতাদের স্পর্ধিত চেতনা আর আসৌরমণ্ডল ছড়ানো তাদের উপকরণগুলি, ততই উধাও হয়ে যায় সংকলনের আরোপিত স্থানিকতা। রচিত হয় কবিতার আরেক বিজয় মুহূর্ত।

গণশক্তি

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থের আঠাশজন কবির প্রত্যেকের কবিতায় এসেছে ব্যক্তিগত অনুভূতি, প্রেম, নাগরিকযন্ত্রণার মেধাজনিত ফসল। কবিতা কোনোদিন নির্দিষ্ট স্থানিক গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে সেই লক্ষণটি সুস্পষ্ট। শ্রীরামপুরের কবিদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত কবি হিসেবে অধুনা চিহ্নিত। এঁদের কবিতাও দু'মলাটের মধ্যে পেয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেকের কবিতাই সুনির্বাচিত।

সূচি

অদ্রীশ বিশ্বাস (১৯৬৭)

অনিলেশ গোস্বামী (১৯৩৮)

অসীমেশ গোস্বামী (১৯৪০)

কল্পর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭১)

কেশব বণিক (১৯৩৭)

গৌতম মজুমদার (১৯৪৭)

গৌতম সরকার (১৯৬৯)

চিত্রা লাহিড়ী (১৯৫৫)

দত্তা (১৯৭৭)

দীপক লাহিড়ী (১৯৫১)

দীপশংকর রায় (১৯৭৫)

দেব গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৫৪)

দেবজিৎ দে (১৯৬৪)

দেবনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৭)

দেবাশিস চক্রবর্তী (১৯৬০)

দেবাশিস মল্লিক (১৯৬৭)

ধ্রুব বাগচি (১৯৫৩)

ধ্রুবন সরকার (১৯৭৪)

নন্দিতা সিনহা (১৯৬৭)

পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫২)

প্রণব বসু রায় (১৯৪৬)

প্রবণপালন চট্টোপাধ্যায় (১৯৫০)

প্রদীপ দাস (১৯৫১)

প্রশান্ত ঘোষ (১৯৫১)

বহিঃশিক্ষা ঘটক (১৯৫১)

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৮)

বোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৮)

মুকুল বসু (১৯৪৮)

মৃদুল দাশগুপ্ত (১৯৫৫)

মহুয়া চৌধুরী (১৯৬৭)

মেখলা সেন (১৯৯৬)

রথীন বণিক (১৯৯৯)

রমা ঘোষ (১৯৪৪)

রামকিশোর ভট্টাচার্য (১৯৫৮)

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (১৯৭২)

শৈলেন কুমার দত্ত (১৯৪০)

সঞ্চরী গোস্বামী (১৯৮৬)

সমর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৮)

सिद्धार्थ सान्याल (१९५०)

सुतपा दाशगुप्त (१९९१)

सुशोभन अधिकारी (१९५३)

सुहास मुखोपाध्याय (१९८७)

सोमनाथ मुखोपाध्याय (१९८८)

सौरभ दत्त (१९९१)

অদ্রীশ বিশ্বাস

মুহূর্ত—১

১

আওয়াজ শুনে শুনে এতদূর এসেছে মৈত্রেয়ী আর তাকে ফেরানো যায় না
মেঘমল্লারে ভিজে গেছে গা
নর্তকীর মতো করে ঘুরে যাচ্ছে দেহ, হাওয়ার দমকে ফুলে উঠছে শাড়ি
বিষ উঠছে শরীরের গোপন সড়কে
মুখ রেখে ফেটে পড়ছি আর সাপের কাপড়ে নীল নিস্তেজ
হয়ে যাচ্ছে মৈত্রেয়ীর দেহ...

২

বন্ধুরা জানতই না তার শেষ অসুখের কথা
চুরি যাওয়া জামা, ট্রফি, কবিতার খাতা
পাইনি বলেও কেউ, মেয়েটি জানে না
নিকট বন্ধুরা তার কবিতা ছেপেছে, সময় বদলে যাচ্ছে ক্রমে
সমস্ত অরণ্যজুড়ে নতুন হাওয়ায় খুলে যাচ্ছে বন্ধুদের হাত।

৩

পাখি ডাকছে ইতিবাহাদুর গাছে অসময়ে
ফুলগুলো নেই জলে ভেজা
ডাকঘর থেকে কোনো ফুল কিংবা খবর আসেনি
তবুও সকলে জানে, সুধা আসবে জানালার ধারে
ফুল রেখে পাখির মতন করে বলে উঠবে, 'ওকে বলো
সুধা তাকে ভোলেনি।'

অনিলেশ গোস্বামী

আমি কথা না বললেও
আমাকে নীরব দেখে
অভিমান নিয়ে ওরা চলে যায় দূরে...
ঠিকঠাক বসে না অঙ্কর, এলোমেলো ঘোরে
শব্দও বাজে না ঠিক, দুমড়ে—মুচড়ে—
সকালগুলিও ইদানীং খুব ম্রিয়মাণ,
কিছু কিছু দুপুর চুপচাপ বৃষ্টিতে ভেজে...

আমি কথা বলি না তাই অভিমানে
এ শহরে হয়তো—বা বহুদিন বর্ষা আসেনি।
আমাদের গভীর অসুখে কোনো নিরাময় নেই,
শুধুই স্তব্ধতা আছে, হাড়হিম আতঙ্কের রাত...

তবু বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে মেতে ওঠে সব
তারপর রং লাগে, সবকিছু সুরে বেজে ওঠে,

আমি কথা না বললেও

ভিক্ষাপাত্র
দলছুট কালো মেঘ চরাচর ভাসাবার আগে
মোছব শুরু হোক সারারাত মছার বনে,
দিনমানে মাধুকরী, আমি যাব কোপাই সমীপে
যেখানে আমার বাউল, তার সাধনসঙ্গিনী—
দেহতত্ত্বের গান হবে তিয়াস আবেশে...
"বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে
নীল জরদ সাদা
কোন ফুলে কৃষ্ণ থাকে
কোন ফুলে শ্রীরাধা"

উচাটন মন ধুলোটের অপেক্ষায়,
একটি জীবন মিশবে সহস্র জীবনে।
অদূরে ভৈরবচক্র, ঘন ঘন আবাহন,
তারা তো জানে না

আমি শুধু প্রেম ছাড়া ভিক্ষাপাত্র রাখিনি কোথাও

অসীমেশ গোস্বামী

পরিযায়ী
যেদিন গিয়েছ চলে
ত্যাগ করে নিজের হৃদয়
শতাব্দীর অন্ধকারে
পরিযায়ীদের মতো নিলে আশ্রয়
তারপর শুরু অবিরাম
শ্রেণিতে শ্রেণিতে সংগ্রাম
দেশে দেশে জয়—পরাজয়
উত্থান পতন অভ্যুদয়
বিজ্ঞান শিশুকলা
যুগে যুগে গড়ল সময়।
আবার ফিরবে তুমি
নিজের হৃদয়ে অবশেষে
হিংসা মুক্ত করে
এই গ্রহে বিজয়ীর বেশে।।

দুটি কবিতা

১

এখানে এখন রাত্রি নেমেছে সবে
ওখানে তোমার হয়তো দশটা হবে
তুমি কি আমার সঙ্গেই জেগে রবে?
রূপালি আলোয় দিগন্ত ভাসে ধূ ধূ
ঘুমোব না আজ তোমাকে ভাববো শুধু।
ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি
সকাল হতেই ডাকে কোন সুন্দরী!
চোখ মেলে দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছে তুমি
ঝলমলে দিন, সামনে শস্য ভূমি।

২

ভাঙতে ভাঙতে ছোটো, আরও ছোটো
আরও ছোটো হতে হতে বিন্দুসম
অদৃশ্য হতে পারো
তবু তোমার সূচনা তারও পিছনে
হায় রে সময়!
দেখি শুধু তুমি আজ আছ
গতকাল নয়।

কল্পারি বন্দ্যোপাধ্যায়

খরা

জল দ্যাখো বিচ্ছেদ বেদনায়

বাপ্প আজ

অশ্রু হয়ে আছে মেঘের আড়ালে।

দ্যাখো ধান কাটার ঋতু শেষ

হয়ে গেলে

প্রতিষ্ঠানের মতো থেকে যায় গোলাভর্তি ধান।

আজ মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে

মনে হয়

পৃথিবীতে অনেক প্রান্তর অকর্ষিত পড়ে আছে।

যেন এতদিন কিছুই লিখিনি

যেন আমাদের কলম প্রতিভা

বন্ধ্যা গোধূলিতে এসে হঠাৎই থমকেছে।

শুধু চেতনার প্রসারণে দেখি

নক্ষত্রলোকের নীচে তার মুখ

ঠান্ডা

নিরপেক্ষ আর আবহমান।

শিরোনামহীন কবিতাগুচ্ছ

১

প্রেম নয়, আবার অপ্রেমও নয়

হয়তো—বা অতিশয় নিঃসম্পর্ক

আত্মতৃপ্ত অজগর রক্তের ভিতরে শুয়ে আছে

দিন যায় আমাদের, শীতের ভিতর দিয়ে

২

গ্রন্থের প্রকৃত কাছে আসা আর

হয় না কখনো, নিবিড় প্রেমিক যারা
প্রতিবাদী যারা ছিল ইতিহাসে
নীল মিশরের দেশে, কিংবা ধরো
গাঙ্গেয় উপত্যকায়, উজ্জ্বল তারার মতো
স্পৰ্ধায় বেঁচে থাকতে চেয়ে
মৃতের ফলকগুলি ক্রমে
গ্রস্তের গভীরে ডুবে যায়

৩

কিছুই লাগে না ভালো আর
যেখানেই যাই অবচেতনার মতো
মুখ্য ব্যবস্থাপক সঙ্গে সঙ্গে যায়

কেশব বণিক

বেলচায় মাটি খোঁড়া
অদিতি—রত্না—অলকা ওরা কতদূর হেঁটে গেল
মল্লিনাথ—মিহিরেরা ছুঁয়ে থাকে সুরভিত সময়
পিকনিক গল্পের আসরে
জীবনের হাতছানি
কতটুকু আয়ু ধরে রাখে এই আয়োজন
নিয়নের চোখ রাত্রির কালিমা মেখে জেগে থাকে
এক অজগর গিলে নেয়
জেরা ব্রশ নাইট ক্লাব মেরুন আঙ্গাসেডার
মুন লাইট পৃথিবীতে
ক্যাথেড্রাল চার্চের টাওয়ারের ঘড়ি
মাকড়সার মাথায় সোনার হেলমেট
বিস্তীর্ণ ঘাসের বুকে নীল সুতো
শব্দময় নীরবতা ছুঁয়ে ছেনে পবিত্র শরীর
বেলচায় মাটি খোঁড়ে সারারাত সারাদিন
অদিতি মল্লিনাথ ওরা কতদূর হেঁটে গেল

আমাদের ট্রেন
আকাশকে কালো করে
হুইসল বাজিয়ে এক্সুগি প্ল্যাটফর্মে ট্রেন এসে যাবে
একটু দাঁড়াও

টেবিলে চায়ের কাপ ধোঁয়া একটু উত্তাপ
ক্ষণিক অনুভূতি
আমাদের পরস্পরের যত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে
একটু দাঁড়াও
চোখের জলে তোমার ঠিকানা লিখিনি
গ্রীষ্মের মেঘের ছায়া আমাদের এই শীতল উপস্থিতি

আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম
হুইসল বাজিয়ে ট্রেন এসে যাবে আমাদেরও
নির্ধারিত সময়ে
আমরা সবাই যাত্রী
একটু দাঁড়াও

অভয়পদ ও
অভয়পদ ও অতসীর সুখী এক গৃহকোণ
রেলিং ঘেরা বারান্দা
টবে আলতো হাতে সাজানো ফুল
আলনায় দোলে পাজামা আর শুভ্র ব্রা
যেমন সব ঘরেই শোভা পায়
তেমনি ওদের ঘরেও একটা সিঁড়ি আছে
ছাদে ওঠার আকাশ দেখার
সকালে আর সন্ধ্যায় ডিগবাজি খায় সূর্যটা
অভয়পদ—অতসীর খোকাটা
মাটিতে শুয়ে শুয়ে দু—পা তুলে আকাশটা দেখায়
ইজেনে ছবির ঘরে রং—তুলি

গৌতম মজুমদার

অস্তিত্ব বিষয়ক কার্ড

জানু ভেঙে পড়ে আছে এইখানে, এই দেখ
অস্তিত্ব বিষয়ক কিছু জাগতিক রেশনের কার্ড
চাল গম ইত্যাদির যাবতীয় মালের এককে
গাঁথা হয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের প্রয়োজনটুকু
যেন সদাহাস্যময় কোন সরকারমশাই
কার্ড দেখে বলবেন আমাদের গুণাগুণগুলি।।

অস্তিত্বজ্ঞাপক এই সাধারণ মানবিক কার্ডে
লেখা আছে আমাদের প্রত্যেকের আপাত বয়স
পিতার পরম নাম, বর্তমান জায়ার ঠিকানা
এইসব লেখা থাকছে আমাদের অস্তিত্বের কার্ডে।

স্বয়ংক্রিয় স্বাভাবিক অভ্যাসের বশে
আমরা প্রত্যেকেই তাই লাইনের শরীরে शामिल
যেন সাপ্তাহিক গতিবেগ থেমে যেতে পারে
যদি হয় শূন্য যায় আমাদের রেশনের দিন।

খাদ্য খাদকের মধ্যে নিয়মিত কিছু কিছু ক্রটি
নিয়মিত ভুল করি কার্ড রাখি অজ্ঞাত দেরাজে
তারপর অলৌকিক কোনো কার্ড উড়ে যায়
শর্করাবিহীনভাবে ফিরে আসে জ্যোৎস্নাময় দিন।

হাঁটু

হাঁটুর ভিতর থেকে ক্রমশ তাগিদ আসছে সোজা হবার।
সোজা হবার কথা প্রত্যেকেই নিজের মতো ভাবছি
প্রতিটি হাঁটুর গায়ে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে

ঋতু ও রেখাময় হয়ে উঠছে প্রত্যেকের হাঁটুর অবয়ব।

আমরা উঠে দাঁড়াবার কথা ভাবছি।

আমাদের হাঁটুর ভিতরে ঘণ্টার আওয়াজ বেজে উঠছে—

হাঁটুর বাইরে অস্থির—তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে দুটি পা ও দশটি আঙুলে।

হাঁটুর কথা এতদিন আমরা ভুলেছিলাম।

ভুলেছিলাম বয়স বাড়লে গায়ের জোর কোমর থেকে

হাঁটুর কাছে স্থির গম্ভীর সরে আসে।

হাঁটুই প্রথম শেখায় আনত হবার সহবত।

গৌতম সরকার

মন্ত্র

প্রকৃত প্রভাব ছিল না তাই, বনভূমি
থেকে উঠে আসা স্রোতও
খড়কুটো হয়ে গেল, এখন
আর কারো পদচিহ্ন
অনুসরণযোগ্য নয়। তাই
সাবধানে পা ফেলতে হয়। না হলে
পায়ে পায়ে বিরোধ
ঘনিয়ে ওঠে। যারা
পুণ্যপুকুর কেটে ছিল একদিন
তারা সকলেই প্রায় পথ হারিয়ে
ফিরে গেছে কিনারায়,
বস্তুত সত্য খোঁজা ছাড়া
আমাদের কোনো মন্ত্র নেই, কোনোদিন।

গর্জন

যদিও বালিকা, তোমার কণ্ঠস্বর ছিল
নদীর মতো, বালকটিও ছিল
সন্তরণে দক্ষ...। তথাপি
মাস্তুল অন্য কথা তুলেছিল, বিবিধ
বর্ণের মতো, বিবিধ অক্ষরের মতো,
বিবিধ সংখ্যাই শুধু অঙ্ক নয়,
বরং বহু বর্ণ অঙ্কেই
অসমান হতে হতে
নদীরূপ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল
সমুদ্র গর্জন।

চিত্রা লাহিড়ী

একটি মৃত্যু
 তারপর
 শাদা কুয়াশাভর্তি মৃতদেহটি তুলে
 রাখা হল কঠিন বরফের বাস্কে
 অন্য দিনগুলোতে ঠিক যেভাবে থাকেন
 আজও সে ভাবেই...
 কার্তিক মাসের অল্প শীতে
 পা দুটো গলানো ছিল নীল মোজায়
 ডান দিকে কাত হয়ে ছিল বিপজ্জনক মাথা
 শেষরাতে দিব্য শুয়ে ছিলেন চুপচাপ শরীর মেলে
 অন্য দিনের মতো
 ভোরের স্কুলের প্রার্থনা সংগীত ভেসে আসছিল
 হাওয়ায়—'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান'
 লরির চাকার সপসপে দাগের পাশে তখন
 গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ছে
 ছোটো কাকুর নীল মোজা খোলার শব্দ...আর
 তার লালচে আঙুলের কাছে নবীন আলোর দাগ

ফেরা

মার্চ মাস। সেবার সীমাহীন উৎসব নিয়ে আপনি ফিরে এলেন। ফিরে এলেন অনেকের সঙ্গে—একা
 একা রক্তের ভেতরে দোল দুর্গোৎসব। আপনি নদীর ধারের সমস্ত পাথর টপকে টপকে নিশ্চিত ফিরে
 এলেন আদিম শ্যামলতায়। সন্কেবেলায় মুক্তির ধ্বনিগুলোকে কুড়িয়ে ভরিয়ে ফেললেন নিজের দু—
 হাত। আপনার দু—হাতের পাতাজুড়ে ছিল অস্থির উষ্ণতা। ফিরে আসার সবুজ অস্তিত্বের উষ্ণতা।
 ফিরে যাওয়ার হৃদের অভিমানী উষ্ণতা।

মার্চ মাস ফেরার তাড়া ছিল না তেমন। তবু সেদিন কাকভোরে সবুজ সুবাউল জঙ্গলে আনন্দ পথ
 হারিয়ে ফেলল অনেকটা ইচ্ছে করেই। অনেকটা অনিচ্ছায় নির্ভুল পথ খুঁজতে খুঁজতে প্রকাণ্ড
 বনভূমিকে পিছনে ফেলে হেঁটে গেল আনন্দ সঙ্গীহীন একা। সামনে শীতল নদী ঘূর্ণিজল। পায়ের নীচে
 একষটি বছর আগেকার উত্তাপহীন আগুনের বেদি।

আপনার দু—চোখে জড়িয়ে এল ঘুম। শ্মশনের ঘুম। মৃদুফুল তখনও আপনার দু—হাতের পাতায়।
দু—হাতের পাতায় তখনও অমল উষ্ণতা।

ঘুমের মধ্যে আনন্দ স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নের মধ্যে আকাশ। আকাশের মধ্যে ভ্রমণ। নীলজামা, ডানা
মেলা সাপ আর চন্দনের কাঠ নিয়ে মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছে বাদামি শবদেহ। এক সদ্যোজাত কবি
ও মানুষ।

দত্তা

স্বপ্নে জন্ম

স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন জন্ম নেয় প্রতিটা মুহূর্তজুড়ে
নীল ক্যানভাসে আঙুল দিয়ে অসংখ্য কোনাকুনি আঁচড় দিই,
চেনাজানা পার্শ্বচরিত্ররা উঠে আসে মনের দেয়ালে
সযত্নে টাঙানো ফ্রেম থেকে,
কথা বলে তারা গোপন ভালোবাসার।

ভালোবাসাকে আমি পরম আদরে রাখি
অন্তরের নিরালা কোণে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায়
উষাতটুকু শুধু তোমাকে এনে দিই বার বার
তোমার বরফময় যদি কখনো গলে হিমবাহ হয়,
গতি ফিরে পায়,
আবার কোনো নদী হয়ে আমার মোহনাতে এসে মেশে!
বয়ে চলে যাব তবে নিরুদ্দেশের পথে স্বপ্ন ভরা বুক।
সাক্ষী রাখব দুই পাড় আর জলের ছলাৎ শব্দকে।

কিন্তু এসব শুধুই স্বপ্নে হয়
চরিত্ররা ফ্রেমবন্দি থাকে নিখর অতীতে।
আসলে, এ খবর কেউ জানে না যে
প্রতি মুহূর্তে আমার স্বপ্নে জন্ম হয়।।

নয়নতারা

নয়নতারারা বাঁচে, নয়তারারা বেঁচে যায়।
কঠিন বাস্তব আর প্রতিকূলতাকে জয় করে
মালির তীক্ষ্ণ আর সতর্ক দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে
পথচারীদের পদতলে দলিত পীড়িত হয়েও
তারা ঠিক বেঁচেই যায়।

নয়নতারারা বাঁচতে জানে ;
আলোকবিহীন পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়ির দেয়ালে
বস্তির আনাচেকানাচে পচা নর্দমার পাশে
কিংবা বহুতল বাড়ির বাড়ানো বারান্দার টবের পাশে
অবহেলিত অপমানিত হয়েও বাঁচে।

নয়নতারারা বাঁচবে,
আরও বহু বহুদিন বাঁচবে।
লোভ—লালসা—বিহীন হয়েও, শত অত্যাচারের শিকার হয়ে
খাদ্যের অভাবে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে, সদর্পে উন্নীত মস্তকে
প্রকৃতির বুকে মাথাটুকু রেখে বাঁচবে।।

দীপক লাহিড়ী

দিকনির্ণয়

কোনদিকে গেলে ভালো হত
 খুব কম মানুষই তা জানে
 পুবে হাওয়া দিলে মনে হয়
 পশ্চিমে কোথাও কি বাদল ঘনালো
 পেঁজা তুলোর মতো বরফ জমে আছে
 পাহাড়ের গায়—কবির দৃষ্টির মতো
 আনন্দ সংগমে অবিরত উৎসুক
 নির্নিমেষ প্রাকৃতিক সময়ের ঢালে
 একরাশ মেঘলা বাতাস এসে বলে দেয়
 হাওয়া মোরগের দিকে অবিরত দৃষ্টি দিও না
 আসা—যাওয়ার সবটা জানলে
 জীবনের আর কোনো রহস্য থাকে না
 সর্বস্ব চূড়ান্ত করে নক্ষত্রে উষ্কার গতি
 এ প্রশ্ন চাপা থাক সময় সংক্ষেপে
 কোনদিকে গেলে ভালো হত, কোনদিকে...

শ্রাবণ

এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় ছুটে যাচ্ছেন!
 সারা আকাশ জঙ্গিপনা করছে সারাদিন
 কাদা—জল ছিটিয়ে অবিরাম ট্রাফিক দৌড়োচ্ছে
 আশ্চর্য, কী এত কাজ আজ না গেলেই নয়
 এটা বর্ষার মাস, ক্ষ্যাপা মেঘ দু—কূল ছাপা বৃষ্টি
 চলতেই থাকবে, জন্ম—মৃত্যু যেভাবে পাশাপাশি হাঁটে
 আচ্ছা বলুন তো চলাচল শব্দের কী মানে
 না—না অভিধান দেখে কাজ নেই, দেরি হবে
 তার চেয়ে আসুন গভীর জলধারায় চোখ রাখি
 কী বললেন আজ বুঝি বাংলা মাসের বাইশ

দিগন্তের ওপার থেকে বেজে উঠছে একশো মাদল
গেরুয়া আলখাল্লা পরে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে কে
চলে যায় কঙ্কালীতলার দিকে!
ডুপকি ভিজে গেছে, গাবু যন্ত্রে জোর নেই কোনো
মনের বাইরে ভিতরে ফুটে উঠেছে একটা ছবি
জ্যোতির্ময় মানুষের, দীর্ঘতর তিনি
কিংবা তাঁর চেয়ে বড়ো কেউ কেউ আছে
শহরে গ্রামে মাচানতলায় বা হাইড পার্কে
কুয়োতলা ভিতরে গভীর কৃষ্ণবর্ণ জল
একটু ফুটে উঠবেন—একটু...এই শ্রাবণের দিনে।

দীপশংকর রায়

আমি
প্রয়োজনের নিতান্ত তাগিদে
সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিই।
ভাবনার সূক্ষ্ম সূত্র গ্লানির মাঝে হারিয়ে যায়—
সাদা কাগজের ওপর বালির আঁচড়ে
দরা পড়ে না সে।
সারাটা বর্তমান কেমন করে যেন
সুস্থির আগামীর ভাবনায় লীন হতে চায়।
তবুও পারিপার্শ্বিক বিবেক জাগাতে চাইলে
সুপ্তিমগ্নতাকে আশ্রয় করি।
নিতান্ত কৃতান্ত না এলে বিলাসে মন দিই।
চলমান প্রবাহে কখনো বা ছিটে লাগে যদি
কালস্রোতের প্রলেপে ক্ষত শুকিয়ে নিই।
অনেকটা দিন অনেকটা মাস চলে গেলে পর—
কী হবে আর! বলে ওপাশ ফিরে শুই।।

দেব গঙ্গোপাধ্যায়

গীতিকবিতা

তখন মাঠের পর মাঠজুড়ে অনিয়ম
তখন খেতের পরে খেতজুড়ে হলুদ তামাশা
এসময় কেউ কেউ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে
নিজস্ব ভবনে
পুরোনো দিনের সব কথা বলে—
এইখানে মাঠ ছিল
এইখানে শৈশবের কানামাছি খেলা
এইখানে—এই বলে থেমে যায়, থেমে
যেতে হয়

কেননা তখন সব ছায়াশ্রাব্য গীতিকবিতায়।

রূপকথা

অনিচ্ছায় রাত্রি বাস করি এক অচেনা শহরে; ঝুলে
থাকে চোখ, চোখের কোটর থেকে
খেলনার বাটি থেকে কিছু বড়ো একখানা ডোঙার
ভেতর, শরীর ছড়িয়ে আছে
ভিতরে কাশছে বড়ো পিতামহ; পিতামহী
কবচের খোঁজে গেছে
তেপান্তর
আধখানা রূপকথা বলা হয়ে গেছে তার; আধখানা
আমার ভেতর।

দেবজিৎ দে

হৃদ যান

যত বার উড়েছি, ভেঙে পড়েছি

ব্ল্যাক বক্স খোঁজেনি কেউ!

তবু প্রতিটি উড়ানের পর

জেগেছে নগ্ন পারাবার

কি তার বাহার! মোহময় ঢেউ

পাড়ে নারী ও নর।

শিকড়ে জড়ানো জলজ ঋণ

ফুটেছে কুসুম মধুবনে,

যত বার উড়েছি, ভেঙে পড়েছি

দু—চোখে পাহাড় চুষনে!

সকাল—সন্ধ্যা গুনেছি ঢেউ

বালুতটে বাসনায় ছবি এঁকে,

ব্ল্যাক বক্স খোঁজেনি কেউ

শরীরে, শরীরে হাত রেখে।

দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

ধূসর প্রান্তরে দিশাহীন হাঁটা
ধূসর একটা প্রান্তর ধরে হাঁটিতে শুরু করেছিলাম
কবে কখন মনে পড়ে না
শুধু মনে পড়ে দিনের আলো চিকচিক করছিল
দিন মাস সময়ের হিসেব ছাড়াই শুধু হাঁটা আর হাঁটা
কখনো মাইমের ছন্দে কখনো—বা চ্যাপলিন
সঙ্গে থাকা মানুষগুলো কোথায় কখন হারিয়ে গেল
হঠাৎ দেখলাম আমি একা
আতঙ্কে গলা শুকিয়ে কাঠ
শরীরের ভিতরটা মৃত্যুর মতো শীতল
বাইরে আনখশির কুলকুল ঘামে ভেজা
জল খুঁজতে গিয়ে দেখি পাহাড়ের মেঘের মতো
কুণ্ডলী পাকিয়ে অন্ধকার নেমে আসছে
দু—হাতে অন্ধকার ঠেলে হেঁটে চলেছি
সামনে কোনো আলোর বিন্দু নেই
যেখানে থামতে পারি।
ফ্যাস্‌ফেসে গলায় নিজেকে প্রশ্ন করি
হাজার বছর ধরে কি হাঁটিতেছি পথ?
পাশ থেকে অশরীরী কণ্ঠ বলে ওঠে
সবে তো একবার প্রদক্ষিণ হল সূর্যকে পৃথিবীর
আলো খোঁজা এত শীঘ্র নয়
নিজেকে নিঃশেষ করে জ্বালিয়ে দাও
আলো পাবে প্রান্তরেরও শেষ খুঁজে পাবে।

দেবাশিস চক্রবর্তী

দায়ী কে?

বস্তির ঘরগুলোর ভীষণ কঠিন চেহারা,

একটি ঘর থেকে ভেসে আসে শিশুর কান্নার শব্দ,

আগুন লেগেছে কচি পেটে।

ঘরের এক কোণে আগুনহীন উনুনের উপর বসানো ভাতের হাঁড়ি।

মায়ের দু—চোখ বেয়ে জল।

একমুখ দাড়ি—গোঁফ নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাবা,

ধোঁয়াহীন ফ্যাক্টরির চিমনির দিকে।

দেবাশিস মল্লিক

ভূমিকার বদলে
দূরে ওই জ্বলে আলো, কিছু নম্র, অনর্থক
বিগত রাত্রিজুড়ে বসন্ত বাতাস
যেন আর্তনাদ ফিরিয়েছে আদরে আদরে
তোমার একান্ত ছুঁয়ে থাকি আমি
ক্ষুধার উদ্বেকমাত্র দাঁড়াই তোমারই দ্বারে
তবু আজও, পরমবাক্য হে
অহেতু বেদনাক্রান্ত আমাকে চেনোনি—

বয়ন শিল্প
ছুঁচ ও সুতোয় সে এক আশ্চর্য কথকতা
বুনে চলে রেশমি রুমাল
আর গোধূলি ঘনিয়ে আসে শিকারি ক্ষিপ্ততায়
'গোধূলি' শব্দটি থেকে
আরও এক সূর্যাস্তগামী দিন ত্যাজ্য হলে
অবশেষ থেকে যায় যাপনজনিত গ্লানি,
কিছু—বা আলস্যও...

...খোঁয়া ওড়ে, ওড়ে ছাই গোসাবার গ্রামে গ্রামে
জ্বলে ওঠে কাঁসায়ের তীর
নিরুপায় ছুঁচ শুধু আসে আর ফিরে যায়
আমরা মনের সুখে দোপাটির চাষ করি
টবে পুঁতি বনসাই, বিষ জমে ঈশ্বরী বাগানে।

ধুব বাগচী

অখিলবন্ধু ঘোষ

অখিলবন্ধু গায়কি একটা বিকেল, নিবেদন তার নরম একটা ভাব
আকাশনীল ওড়নায় ঢাকে আকাশ, কোথায় যেন প্রাণের একটু অভাব...
ধরে নিলাম তর্কের খাতিরে, বিকেল নয় বিকেলের মতো আলো
বকুল জুঁই ভাতের থালায় বসে, ন্মিধ্বকাব্যে জীবন জমকালো...

নৈর্ব্যক্তিক

মাঝরাতে ট্রেনের হুইসিলের মায়াবী ডাক শোনে বিষ্ণুপুরী টপ্পা
দেখা হয় বাল্যের খিড়কিদরজা আর বউঠান বনবীথির সাথে।
ঋণগ্রস্ত ঝরাপাতার শরীরে এত মমতা এখনও!
কয়েক ফোঁটা স্পর্শ গড়িয়ে পড়ে বালিশে, যতিচিহ্ন আমন্ত্রণ বাজায়,
সে জানত কিছু আহুদী বৃত্ত এখনও কাঁদাতে পারে কোনো বালককাল
শিশিরের পতনের শব্দ কি জীবনানন্দের একার? জন্মান্তর ছাড়া
কতবার জন্ম হয় তার!

ধুবন সরকার

আমি ও আমার দ্রুশকাঠ

১

একটি ছিন্নভিন্ন শরীর আত্মকথা লেখে।
লেখে অসহায় স্পর্শ ভেঙে ঘন কালো ছায়া
কীভাবে শরীরী বিশ্বাস ও অন্তর্ঘাতের
দৃশ্য রচনা করে
অদৃশ্য ফাঁসের স্বপ্ন দেখে
শোকপ্রস্তাব পাঠ করে
আমি ও আমার দ্রুশকাঠটি নির্বিকার থাকি
আমরা ভিজতে ভিজতে
নিরীহ নিরপরাধ মানুষদের বলি—
ধীর পায়ে ধুলো উড়িয়ে এসো,
পলকহীন গোত্রের শিহরণ
স্পর্শ করে যাও

২

দ্রুশকাঠটির নীচে
আর্য—অনার্য শরীর জমা হয়
যার তিন ভাগ জল ও এক ভাগ
দীর্ঘ এবং দীর্ঘতর ছায়ায় গড়ে ওঠা অঞ্চল
কখনো মেঘ, কখনো বজ্র—বিদ্যুতের ঘিরে ফেলা
ক্ষতবিক্ষত দারুণতা মাত্র
অসুখের ঠিকানায় বিলাপ করা
ভাঙা নির্জন স্পর্শ
অশ্বক্ষুর হৃদের বাসিন্দারা
চশমা ছাড়াও দেখেছিল তাকে
বৃষ্টির দিনে যে
কাগজের ঠোঙা পড়েছিল

নন্দিতা সিনহা

চিরন্তন

ঢেউ আসে ঢেউ যায়

বাতিঘর সরে যায় দূর

নক্ষত্র বিলাসী রাত আজীবন জেগে থাকে

অভিমাণে বাজায় নূপুর।

মুঠো মুঠো বিশ্বাস

কীভাবে ছাড়ায় হাত

দীর্ঘ পথজুড়ে বারবার তাড়া করে

জীবনের বিচিত্র সংঘাত

প্রেম তবু হয় না উৎখাত।

ফুসফুস ধমনী শিরা

বাহিত পরম্পরা

একলা আকাশ মেঘ সিঁদুরটি চিনে রাখে

দু—হাতে আগলে স্রোতধারা।

সেভাবেই বেঁচে থাকে

মৃত্যু আগলে রাখে

শান্ত জলে ভাসে অবগাহনের কাল

প্রেম শুধু লক্ষ হাতে, জীবনের সরায় জঞ্জাল।

রাতের বেলা

সাজানো—গোছানো বাড়ি।

ঘরের সমকোণ, ত্রিকোণ সবাই একসাথে,

জলের বোতল, লেখার কাগজ, চশমার খাপ,

চোখ বুজে থাকলেও কাছে আসে।

তবু মাঝরাতে কান্না পেলে আমি কোনো হাত খুঁজে পাই না।

যে ফাজিল কুকুরটা শাঁখ বাজালেই ভেঙিয়ে ডাকে

সেও তখন রাত অভিসারে।

সুইচ বোর্ড জায়গাতে থাকে না।

দেবরাজের মোমবাতি অন্যের ঘরে মৃদু আলো হয়ে যায়।
গাছ ফুল পাতা ঘুমিয়ে থাকে
আমার ইচ্ছা, তেষ্ঠা, বাসনা মাথা রাখে বালিশে
আমার আঙুল হাতড়ে বেড়ায় আরেকটা বাহু,
মাথা রাখার পরিসর।
পুরো বাড়িটাই তখন এলোমেলো।
কান্নারা শুধু ছুটে বেড়ায় লাগামছাড়া।

পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণমালা, বর্ণমালা

কোনো কোনো বর্ণমালাকে ডেকে বলি, 'এই তো এসে পড়লুম
তোমাদের দরজায়, বসতে জায়গা দাও'

কোনো কোনো বর্ণমালাকে ডেকে বলি, 'পোশাকটা বদলে নাও
ফাল্গুন তো খেলে গেল আমাদের দেশে'

আমি ছাইদান উলটে গেঁথে দি আমার সিগারেট

আমি হাসি, হেসে হেসে উড়ে যায় আমার চুল

আতপ্ত চুম্বনের মতো লুফে নিই টুকরোটাকরা সুখ

বর্ণমালা পা টেপে, যৌনতায় খুলে দেয় নিজস্ব উরু

আমি তাকে বোঝাতেই পারি না—

গভীর রাতে আমি এক কালো সাহেবকে নিজেরই পদ্য

হাতে চলে যেতে দেখেছিলুম বিশাল অরণ্যে।

স্বপ্ন সেলাই করো তুমি

জানলার পাশে মুখ বাড়িয়ে পুরোনো কাঁথা সেলাই করবে তুমি

জীবনভর স্বপ্ন সেলাই করার ব্যস্ততায় তোমার বাগান থেকে

বান্ধবীরা ফিরে যায় একে একে

শুধু গাছের পাশে জেগে থাকে গাছ, ঘন গরাদের ফাঁকে

গণ—আন্দোলন করে নাকি নৈসর্গিক রোদ

'স্বাধীনতা দাও, স্বাধীনতা দাও—'

তুমুল বেদনায় তোমার হলুদ আঙুলে গেঁথে যাবে ছুঁচ

দূরে বাঁকা পথ থেকে ছুটে আসে মরা বসন্তের ধুলো

ঝরনা কোথাও নেই, মরুভূমির মতো উষ্ণতায় কেবল বিবর্ণ

হয়ে উঠবে তোমার চুল

আর তখনও, দেখো, আমি তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছি ওই।

প্রণব বসু রায়

পাখি সংবাদ

অভ্যন্তর দেখব বলে একটু ঝুঁকি, লাফ দিই জলে
ফিসফাস কেউ কথা বলে?
প্রকৃত মুক্তো পেতে গিয়েছি অতল, শূন্যে মুঠি খুলি
হাতে কী জমল এগুলি!

ব্যস্ত সম্পর্কের ভিড়ে একলা থাকি, এই বেশ ভালো
তাও দেখি জড়ালো জমকালো—
কী করে বোঝাই বলো এ প্রকার নয়, চেয়েছি গভীর
রাতক্রান্ত পাখি যে অধীর...

সমাজ নিয়ম

এমন সম্পদের ভার আমার দুর্বল, তাকে তাই
দূরত্বের যত্নে রাখা ভালো—
যে দাসীর ভাগ্যে জাঁহাপনার আড়ালের প্রেম জোটে
সে হতভাগী তাকে গর্ভে যাপন করে নীরব গোপনে
উল্লাসে ভাসে না কোনোদিন

এরকম সমাজনিয়ম সম্রাটের নামেই রাষ্ট্র হয়ে যায়

প্রবণপালন চট্টোপাধ্যায়

দিনলিপি

কিছু কথা থাক অগোচরে, ঘষা কাঁচে
মেঘের বুকেতে জলের বিন্দু হয়ে
কিছু চুম্বন দ্রবীভূত থেকে যাক
শিশিরের টানে, শিশিরাক্ষের গায়ে।

কিছু অভিমান ছুঁয়ে যাক ভিজ়ে মাটি
মচকানো কুঁড়ি চৈতী বাতাস মাখে
কিছু সমাবেশ থাক না মনেতে গাঁথা
হলুদ ঘাসেতে প্রান্ত পথের বাঁকে।

কিছু অপমান আঁচলেতে থাক বাঁধা
গচ্ছিত হোক লক্ষা পান্তা ভাতে
কিছু প্রজাপতি তবুও থাকবে জেগে
গুটিপোকাদের কালো অক্ষর রাতে।

কিছু আঁচলের ছেঁড়া কার্পাস তুলো
কবে উড়ে গেছে অশোকবনের পথে
কিছু উন্মাদ এখনও কবিতা লেখে
প্রেম সম্বল, প্রেমিকের ধারাপাতে।

অভিমুখ

ইচ্ছে করে,
মুঠো ভর্তি ধুলো উড়িয়ে দিই
আমার সামনের ব্যস্ত পথে—
অন্তত জানা যাবে
এখন বাতাসের অভিমুখ।

চারপাশের অভিমুখ চেনা
ক্রমশ দূরহ থেকে দূরহতর—
কেননা, কেউ মুখোশ খুলছে না,
পুরস্কারের আশায়।

প্রদীপ দাস

আগুনে ভাসাব
নিষেধের কাঁটাতার ছিঁড়ে
এই আমি এগিয়ে চলেছি
হে সুখ অবরোধ দৃঢ়তর করো!

দু—হাত সমুখে পেতে একা
আজও পথে দাঁড়িয়ে রয়েছি
হে দুঃখ, তুমি যেন নিঃস্ব হয়ো না!

তিলে তিলে ধ্বংস হওয়ার আগে
কেন এ শরীর ছুঁতে চাও
হে নদী আমি অস্থি আগুনে ভাসাব...

যাত্রী
দাঁড়িয়ে তীরে হলুদবাড়ি প্রিয়ার সজল আঁখি
মরাই আমার শূন্য যে রয় কাঁদছে ভিটের পাখি
অঙ্গনে আজ পড়েনি বাঁট গঙ্গাজলের ঝরা;
দূর—বিদেশের যাত্রী আমি মৃত্যু স্বয়ংবরা।

প্রশান্ত ঘোষ

প্রাচীর

ভ্রমর ঘাটের শেষ সিঁড়িতে একা আমি
নদী যেখানে খুব কাছাকাছি
ছলাৎ ছলাৎ নূপুরের শব্দ শোনায
টেউয়ের পরতে পরতে শিকল ভাঙার গান
ক্ষয়ে যায় চাঁদ তখনও স্পর্শে ক্ষীণ
দরিয়ায় হারান মাঝির ভাটিয়ালিতে
ছই—মহলে নিশিজাগা পতঙ্গের প্রেম
হলাহলের অমৃত মস্থনে মুখোমুখি।

মাটি আর জল নিকট যোজনে আমরা
তবুও কোথাও এক অদৃশ্য প্রাচীর
মেরুদ্বয়ের মাঝে রেখা টেনে দেয়।

বহিঃশিখা ঘটক

আত্মহনন

আজ কোনো কবিতা নেই আমার কাছে
শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের সমাহার
পৃষ্ঠা উলটে সারা বছরের ধারাপাত
ক্লিশে হওয়া সেই শপথ প্রতিবার
আজ আমার কাছে গদ্যরাও পথহারা
আতঙ্কের প্রাকারে গোঁথে তুলি কথামালা
পাছে দেখে ফেলি চোখ ঢেকেছি কালো চশমায়
সব অঙ্কের সমাধান এইভাবে...

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রকল্প

বোকা বাক্সের ওপর কয়েকটা হরিণ
থমকে দাঁড়িয়ে আছে বোকার মতন।
এই চিত্রকল্প ছুঁয়ে কয়েকটা জিরাফ
এবং মানুষের মতো ঠিক কয়েকটা মানুষ
পরস্পরের দিকে ছুটে আসে গোঁয়ার ভঙ্গিতে।
তফাতে দাঁড়িয়ে হাসে স্বপ্নময় কাক
কলহের ইচ্ছা তার মরেছে অক্লেশে।

কবিতাবাসর

কবিতা উৎসবের ঝুলির মধ্যে ছিল গান
যে গানের ওপার থেকে মুখ বাড়াচ্ছিল সে।
কে যেন বলল, এটা কৃষ্ণসার হরিণের গান
ফ্রেডরিক নগরের পথ ধুলায় মলিন।
আশ্চর্য হরিণের গান স্পর্ধিত রাতের পর্দায়
বেজেছিল—ও শহর, বাঁচো ইচ্ছেমতো
যে হরিণ মরে যায় আর সব মৃগদের মতো
তার চোখে জেগে থাকে কবিতাবাসর।

বোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

তীর্থ—কাকে চাও
তীর্থ তুমি কাকে চাও,—
এক সাধক বা
গোধূলির রং গায়ে মেখে যে সজ্জন বসে
না ওই প্রেমিক—প্রেমিকা যুগল
সাধক—নির্বাণ চিন্তায় মগ্ন
শ্রৌড় আকাশের দিকে চেয়ে সন্ধ্যা ও রাত্রির অপেক্ষায়
কিন্তু প্রেমিক—প্রেমিকা—
জীবনের কথা বলে, জীবনের গান গায়
সাধক ও শ্রৌড়ের তোমাকে দেওয়ার নেই কিছু আর,
ওই প্রেমিক—প্রেমিকা—
জীবনের সব মূল্যবান সম্পদে সাজানো অর্ঘ্য তোমায় প্রদান করবে,
তীর্থ,—এখন বলো তুমি কাকে চাও।

কল্লোলিনী
কথা ছিল নানা রঙের নানা রূপের
কথা বলা বিকেল বেলা
কথা ছিল সন্ধ্যা হলে চাঁদের আবির্ভাব
গায়ে জড়িয়ে অরুণতীর গল্প শোনা
ঘড়ির দোলক নিপুণভাবে ভাঙছে সময়
সিঁড়ি ভেঙে ঝুপটি করে নামল এসে মৌন রাত্রি
হঠাৎ চমক সামনে এসে যেই দাঁড়ালে
বুকের নীচে তুমুল ঝড়ের উথালপাথাল
সোনার কাঠির স্পর্শ যখন আলতো দিলে
সকাল বেলার তর্জনীতে দারুণ শপথ
ভেঙে তখন শরীর হল কল্লোলিনী।

মুকুল বসু

অন্ধকারে বহে যায় নদী
ব্রিজের অনেক নীচে অন্ধকারের মতো জমে আছে স্মৃতি
তারো নীচে কলস্বরে বহে যায় নদী
ছল ছল বহে চলে স্মৃতিময় জলরাশি
বড়ো দ্রুত চলে যায় সাগর সঙ্গম
না কি গতি তার বিস্মৃতির অনন্তের দিকে
কিছুই জানি না আমি কিছুই বুঝি না
আমাকে চেনে না আর এসকল স্মৃতিরশি
জমে থাকে ব্রিজের অনেক নীচে স্তরে স্তরে
অন্ধকারে মেঘবর্ণ লাগে
গতিশীল জলরাশি শব্দময় প্রশ্ন করে
আমাকে অস্তিত্বজনিত
কে আমি? আমি বলি, পথিক এক ক্লান্ত পায়ে
এসে দাঁড়িয়েছি ব্রিজের উপর
তুলে নিতে অভিলাষী স্মৃতিস্পর্শ হাসি—গান মণিমুক্তাগুলি।

গোলাপ বাগানে রাত্রি
এখানে রাত্রি বড়ো দ্রুত নির্জন হয়ে যায়
রাস্তার আলোয় চিকচিক করে ওঠে ট্রামলাইন
অদূরে ফুটপাথের কিনার ঘেঁসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে
দীর্ঘ গাছের সার
যেরকম নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে ভুলে যাওয়া
রেলগাড়ি, চড়ুইভাতি অথবা চিঠি
ঘুমের স্পন্দিত কিনারে
শুধু একটানা হাওয়ার শব্দে ঝরে যায় বীজ
শব্দের সংকেতে ঝরে যায়
ঘড়ির গোল স্তর ডায়াল থেকে ঝরে যায়
অপ্রয়োজনীয় সেকেন্ডের কাঁটা

সরে আসে চুম্বন থেকে ঠোঁট, চিঠির পঙ্ক্তি থেকে দূরত্ব

গোলাপ বাগানে রাত্রি বড়ো দ্রুত নির্জন হয়ে যায়।

মৃদুল দাশগুপ্ত

চারটি কবিতা

১

গুপ্তপুঁথি আমি দিয়ে যাব পাণ্ডুলিপিখানি
বিরিট কাঠের ওই পেটিকায় রেখে দিও গৃহে এক কোণে
সময়ে কিছুটা কাল, ক্রমে তুমি ভুলে যাবে, জানি
কী আছে ভিতরে শুধু ভাবনাই ঢেউ দেবে মনে।

সহজ সরল বাক্সে মনে হবে দাপাদাপি চৈত্রের বিকেলে
কলরব, হট্টগোল, ঘোর রাতে ক্ষুধাতুর ক্রন্দনের ধ্বনি
আবার প্রভাতে হাসি খিলখিল—আমাদের একশত ছেলে
তখন মুদ্রণে দিও, ওরা যেই চৈচাবে—জননী

২

যেই হস্তক্ষেপ করি, তুমি বিন্দু বৃত্তাকার হও।
হয়েই ঘুরতে থাকো, তখন বাতাস বয় শন শন শন
এ গৃহে পাড়ায় ক্রমে শহরে সদরে, টোকা দিতে
পৃথিবীও ঘোরে
যেন বিপরীতে, জোরে। চন্দ্র সূর্য হতবাক হয়ে
কে আগে উদিত হবে, ভাবে
কী কাণ্ড ঘটানো চিত্র, বিচিত্র হওয়ার পথে
বন বন বন।
গেল গেল রব ওঠে তারায় তারায় আর
পাড়ায় পাড়ায়
পাহাড়ের চূড়ে যেন হায় হায়, সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
হাহাকার মরু সাহারায়
পুনরায় হাত দিই, এবার এবার থামো
তখনই তো হয়ে যাও, স্তন

৩

ভীত ও চঞ্চল কেন মনে হল তোমাকে দর্পণ?
আমার করুণ ছায়া উঠেছিল অতিরিক্ত দুলে?
দুটি হাত মনোযোগ ভুলে
আঁচড় কাটার মতো হয়েছিল, তখন তখন?

আয়না তুমি কি তাই ঈষৎ ছলকে পড়া
শুষে নিলে কিছুটা জীবন?
হতে পারে। হতে পারে। তথাপি উদ্বেগ কেন
কেন কাছে মৃদু ঝন ঝন?
ওরা, ওরা ভয় পায় ঘুলঘুলি ছিটকিনি
আত্মীয় স্বজন

৪

আড়ালে অনেককাল একা একা পড়ে ছিল
ধুলোয় কাদায়
এমন হয়েছে হাল
থেমে গেছে এ সকাল
সমবেত ঝুলকালি ধোঁয়ার বাধায়

গ্যালন গ্যালন জলে কে ধোবে এখন
বিপন্ন বিপদগ্রস্ত
শূন্য দৈর্ঘ্য, শূন্য প্রস্থ

অন্ধকার মন

মহুয়া চৌধুরী

তেজস্ক্রিয়

প্রথমে তুষারযুগ ছিল, এত কষ্ট ছিল না আমাদের
ছিল সিলমাছের চামড়ার জামা, কাঠ কুঁদে বের করা তেরো—হাতি ক্যানু
ছিল আলতাপাড় গরদের শাড়ি খালি গায়ে, ছিলেন দুজন—একজন
পির—পুরোহিত

পুরানো লাইনের মরিচায় মালটানা ক্রেন নত মুখ তুলতে গিয়েও যেত
থেমে

এঁদো ডোবা, পায়ের পাতা, গোড়ালি ভেজে কি ভেজে না বরফগলা জল
শাপলা আর কচুরিপানার ঝাড় তবু তার নীচে শ্বাস আটকে মরেছিল বাবাকু
ও বাবলা;

পেটখসা শিশু লালসুতো ছিটছিট বমি তোলা কাঁথার ভেলায়
উড়ে যেত ফুটফুটে চাঁদনিত, ছিল চাঁদ

দিন নেমে আসার সময় আমাদের পাড়ারাজপথ খুলে যেত এপারে
ওকূলে

হার্লেমের বারান্দায় গোড়ালি মুচড়ানো পায়ে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের জুতো
তার অন্তর অবধি

ঠিকরে যেত দু—ভুরুর মাঝামাঝি বুলেটের ছ্যাঁদা তার উপর বেসবল
টুপির কার্নিশে

হান্ড্রেড—টোয়েন্টিফিফথ স্টেশনের গোলপানা পদ্মবীজ ছাউনিত
টিকিটবাবু

হরদম তাঁর কুঁজো হওয়া কাঁধ ঢেকে নিত সবুজ টিকিটঘরের মঠখানি

এখন, খনির ধারে দাতব্য চিকিৎসালয় রুগণ তেজস্ক্রিয় তার ভিত
দোরে মুখ খুবড়ে পড়ছে কষে ফেনা নীল খনিজতৈলবাহী ট্র্যাক্টর—ট্রেলার
হাতরুটি চালার সামনে ডিমে লণ্ঠনের আঁচে দিনযাপন করতে গিয়ে
থমকে যাচ্ছে কেউ

সোনামুগ ডাল খসে পড়ছে তার ঈষৎ ফাঁক বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মাঝে,
আমাদের বিষতিক্ত হাওয়ার ফেটে পড়ছে রূপ

ফেরিঘাটে এসে ঠেকছে ভিতরে—বাইরে জ্বলন্ত নৌকাটি
 পোড়াইটের চণ্ডীমণ্ডপে ধুয়ে যাচ্ছে লোহায় পুড়িয়ে দাগা দেওয়াল—লিখন
 হাত চিহ্নে ছাপ দিন, উন্নয়ন প্রকল্পে
 পৌঁছে দিন মোমকাগজ পাঁউরুটির মোড়কে ওষধি

পাহাড়ের ঢালে পুড়ে ঝামা আমাদের গ্রাম তার ছায়াসন্ধ্যা রং ;
 ভাঙা কার্নিশের পাথুরে সলতের মতো ডগা
 ছাদে দড়িতে ধিকিধিকি ছোটো জামা লম্বালম্বি দাক—কাটা ইজের
 যুদ্ধবিরতির বিভা গুমরে উঠল নখ থেকে চুলের ডগায় ঝলসে উঠল
 দিগন্ত অবধি গেল নিভে
 তাকে এড়াতে গিয়েই পারার সেতু থেকে ঝাঁপ দিল আমাদের
 পাগলপারা শকট

হাওয়ার প্রবল ঋতু
 নবপল্লব মনোবাসনার পথে কী রকম তোমার ত্বকের আভা
 পড়ে আছে,
 ধূলি হয়ে উড়ে যাচ্ছে, ধূলি—
 অল্প তিক্ত—কষা শ্রাবণ ডুবে তলিয়ে যাচ্ছে
 বাঁকা, কোঁকড়ানো পাতার মতো খুতনির টোলে ;
 ভিজে যাচ্ছে বিদ্যুৎপ্রভা ঠোঁটের কোণে হাসি,
 ছোট টিকিটঘরের লাল—সবুজ লণ্ঠন ও বুক—উঁচু বেড়াবিনুনি,
 ভিজে যাচ্ছে বিছানো ফলের পসরা, পসারিণীর মুখে উষ্ণি,
 হাতে মোটা খাড়ু,
 আর বৃষ্টির মধ্যে এক এক করে ফুটে উঠছে আগুনের দৃশ্য—
 যে ছাত্রবিক্ষোভ এই প্রজন্ম কখনো দেখেনি তার চকিত ছায়া,
 মাটিতে আছড়ে শব্দে শব্দে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে তোমার
 চক্ষুভ্রাণ,
 একা, মুখ না—ফুটে বলছ,
 'ঐহিক চন্দ্রাতপ, ফুলে ওঠো, দ্যাখো
 কথা বলে উঠছে দুর্গের চার কোণে নিশান দেওয়া গাছের
 সমস্ত পাতা,
 নীচে গেড়ে রাখা হাঁড়িতে যখ, পরিখার জলে

সঙ্গত মরণগীতির মতো ছুটে আসছে নৌকো,
তার গলুই ও পালে চাঁদ ঢালে পড়ছে'—
এই ছবি চিনে উঠে
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া তোমার কপোল অশ্রু ও আতপে
মাখামাখি,
করতল শিখিল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেতে যেতে
শেষে গলে গেল প্রাণবায়ু—
অথচ তোমার দৃষ্টি সর্বত্রগামিনী হয়ে রইল ;
ঠাকুরতলা, রাধারুক্মিণীবল্লভের চতুর্দোলায়
সর্বত্র সময়টুকু রইল শুধু সন্ধ্যার, শুধু দুঃখী মুখের,
শুধু কয়েক পুরুষ আকাশ—বাতাসজুড়ে বর্ষণের,
আচমকা দুইগাছি মালার নাটকীয় বিবাহের,
গন্ধলেবু গাছের পাশে মৃত পড়ে থাকা নিরপেক্ষ—

রৌদ্রালোকিত এই মৃত্যুগুলি ছাড়া, দেশবিভাগের পর,
আমাদের আর কী রয়ে গেছে বলো।

মেখলা সেন

চিরকুটে লেখা

দিবির হেসে কাটিয়ে যাচ্ছি আদুরে বাড়ি
বালির মতন নাম—ঠিকানা আমার যত,
একটু করে হারিয়ে দিতে আমিও পারি
ফুল—বাগিচায়, জংলি বুকের একলা ক্ষত!

মোম জ্বালিয়ে এবার না হয় পড়েই নিও,
লিখছি আমার ভাবলেশহীন কৃতজ্ঞতা।
আলোর নীচে ছায়ার বৃত্ত; তাতেই আমি...
একলা দিনে রোশনি যখন গল্পকথা।।

শ্রাবণ দিনে

কিছু অসুখের দিনক্ষণে
আবৃত থেকে যায় দেহজ সংসার
একরোখা, অসাড় পশমে,
এভাবে, দীর্ঘ হয়ে আসা শীতবায়ু
সম্ভাব্য ব্যর্থ অবশেষে—
পরিচিত গাছের গায়ে
সাবলীল চিহ্ন সাজিয়ে যেতে
শেষতম শ্রাবণ—দিনে।

রথীন বণিক

সিরাপের দিনগুলি

১ এ রাতের সূর্যটা...

অনেকটা ঠিক আঙুরের ফলার মতো

জানলার কাছে রেখেছি হুইসেল

ন্যাপকিন ফুলেদের আশ্চর্য বোঁটা খয়েরি ভ্রুণ রানে

২ অ্যামাজনে রোজ দূর আনব বলে খোলা হটস্পট

তৃণভূমি পোশাকে চেক করেছি সফটওয়্যার

জীবনের ঝরাপাতায় বৃষ্টি না এঁকেই পালিয়ে যেয়ো

না প্লিজ

৩ পুড়তে পুড়তেই ডার্লিং এতটা শরীরের সাথে

জার্নি

হোঁচট খাই বলেই কি অদ্ভুতভাবে সিঁড়িগুলো...

আমার সাথে পরিচয় করে নিয়েছে

৪ শব্দহীন হবার চেষ্টা লড়ি

যখন গোটা মাঠটাই হস্তমৈথুন করতে থাকে...

জল খসানো প্রকৃতির সাথে আমাদের সুন্দরবন

এলেই দেখা হয়

হিরো বাউন্ডারি কবিতাগুচ্ছ—১

পিদিমের আলোর রিদিমায়

এঁটো রাজভোগ লোকালে চেঞ্জ বলতে রাজধানী

আলনা এলেও কত হোলস্কোয়ারে

আমি মাঝে মাঝে বুঝিই না

আয়না কীভাবে

সুচিহ্না সেনকে মনস্তত্ত্ব পড়ায়

মাঝবয়সি হয়তো বা আমার ছেলে দাপুটে

যুক্তাক্ষরে

ফেনা ফেনা জিভের বিভায়

দেওয়াল পত্রিকা এত না এনে

রাতকে বরং হয়ে যেতে বলি ঋতুমতী

হরাইজেন্টালে

যমরাজও যোনি আনতে ঘুরপাক চায়ের

দোকানে...

রমা ঘোষ

বাসস্টপে

খণ্ড পাথর জুড়তে না পেরে ওরা
গুঁড়িয়ে মেশাল মাটির কোমল স্তরে
একটি হরিণ মাড়াল সে—মাটি দ্রুত
পার হয়ে গেল রাঙচিত্রের বেড়া
ফোটা গোলাপের শরীরে তখন শোক,
ছোটো পাহাড়ের দল নয়—ন—টা হাতি
একটাও কথা না বলে খুঁজতে নদী
ধূসর মাঠের উত্তরে নিল বাঁক
জামবীজ ফেটে ফুটল পত্র দুই
রাতে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা দিন
লক্ষ করেনি, বাসস্টপে এক যুবা
এমন কত কি ভেবে পকেটের থেকে
হাতে তুলে নিল মাউথঅর্গ্যান এক
কার্তুজ ভরা পিস্তল ঝোলা ব্যাগে।

অহংকার

দুর্বোধ্যাসের সবুজে রক্ত ছিটিয়ে দিচ্ছে ও কে?
গরমভাতের সঙ্গে আহারে কলমির ডগা ছিঁড়তে
ঘাটে নেমে দেখি কাটামাথা লাশ পুকুরের জলে ভাসছে
একখানি নীল আনত কুসুম মৃতের বক্ষে দুলছে
ধানকাটা মাঠে শস্য খুঁটতে দেখি আঙুলের খণ্ড,
অহংকারের তির এসে এক বালকের পিঠে গিঁথল—
এসবের কোনো প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল কিনা
কাকে আমি আজ প্রশ্ন করব আগুনের ভয়ে ক্লিষ্ট,
গ্রাম ছেড়ে কেন ইঁদুরদৌড়ে গর্তে লুকিয়ে মরছি!

ঝড়ের আঘাতে ভেঙেছে কুটির আবার নিয়েছি গড়ে

বন্যায় ফেঁসে ফের হাল ধরে পেয়েছি দ্বিগুণ লাভ,
মানুষ যখন মানুষের দিকে প্রতিহিংসায় জ্বলে—
জ্বলে পর্বত সমুদ্র নদী—বীজে অঙ্কুর ভস্ম।

টাল

ভিতরে কাঁপন মৃদু টাল খায় মদ
চলকে ছলকে ফোঁটা স্নেহগ্রীন লতা
ঋতু বদলের ঘাটে কটি রাজহাঁস
নৌকায় বসেছে মেয়ে—যাবে ভিনপার
ব্লুইশ ডানার মাস্তুল আনচান।
জারুল কাঠের বাড়ি আছে কি ওপারে
মেঘের ওড়না ফের জানালায় শ্লথ
জাফরান রঙে আঁকা চাঁদ দরোজায়
হেলানো বাঁশের সিঁড়ি একটু পিছনে।
কাঁপা আঙুলের ফাঁকে ঝরে পড়ে খই
কী জানি কোথায় ঘোড়া একা চলে যায়।

প্রয়োজন

যামিনী গভীর এক
কী যে হল আলুথালু ঘোরে
প্রবল নদীর টানে ছুটে গিয়ে জানি
নদী আজ বাড়ি নেই
সে গেছে কোথাও কোনো গাছে জল দিতে।
শোনো, বাড়ি ফিরে এলে তাকে বলো
পাথরেরও কখনো কখনো তীব্র তৃষা
জল প্রয়োজন।

রামকিশোর ভট্টাচার্য

শূন্যরাও দেবী হয়ে ওঠে

অপ্রস্তুত এগিয়ে চলেছি মূর্ছার ভিতর। প্রতি ধাপে শূন্যের দল
গল্প জোড়ে পাশে। উল্লাসও সঙ্গ ছাড়ে না। পায়ে বাঁধা
জীবন বাজছে নতুন ঠিকানার সুরে। শূন্যের ভিতরেও
কিছু শূন্য থাকে, যারা প্রতিক্ষণ আত্মীয় হয়ে ওঠার বাসনায়
শৈশবের দিনগুলিকে বিন্দু বিন্দু লাগিয়ে দেয় প্রতি লোমকূপে।
আমি তাদের টোল পরা গালে জোছনা মাখাই, তাদের
ফুল দেওয়া হবে, হলুদ চন্দন, ভেবে নানা রং পতঙ্গ ওড়াই
ঝাপসা এক কৃষ্ণগহ্বরের দিকে। একথা জানাই ছিল না
শূন্যের ভিতরেও নানা প্রশ্ন থাকে। নিঃশব্দ অলংকার। তাই
দূরত্ব বজায় রেখে কতজন শূন্যের হাত ধরে এগিয়ে গিয়েছে।
শূন্যের ভিতর কোনো আলো নেই। তবু কত আলোদের ছায়া!
ঘর সাজানোর গান। অচেতন শূন্যজল, নমস্য শূন্যরা, বাষ্পের
মায়ায় দু—একটি স্বপ্নের ফোঁড়। হাত ছড়িয়ে রোমাঞ্চের দল।
মাঝে মাঝে মূর্ছার অন্তরে উর্বরতা দেখে শূন্যরাও দেবী হয়ে ওঠে...

প্রত্ন—আত্মীয়

চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বাড়িটা আমার ঠাকুমা।
তার গায়েই আমি ছক আঁকি মস্তুর জীবনের। আমার
বাবা এ বাড়ির বইঘর...প্রতিদিন দেখি জাল বুনছেন
অক্ষরের...শব্দ দিয়ে টেবিল সাজাচ্ছেন। পৃথিবীর
একদিক যখন আবহমান বাঁশি বাজায় তখন প্রার্থনা ঘর
জ্যাঠামশাই হাতে দাঁড়িয়ে মন্ত্রের সুরে ঠাকুমার ঝাঁকড়া
চুল জড়িয়ে নেন গায়ে আর রান্নাঘর পিসিমা আপন মনে
গেয়ে যান পাঁচফোড়নের গান। বারান্দায় সেইসব বালিশ—কাঁথার
দিনরাত খেলা করে, যাদের পৌষ—মাঘ একাকার ছিল রোদের
শাসনে। প্রতিবেশি পুকুরটি আজকাল আর চাঁদের জোয়ারে
ছায়াছবি আঁকে না। গল্পবেলার মাঠ, ঘাসের ভিতর বাল্যবেলার

প্রতিধ্বনি, নোলোক পরা গোধুলির হাতছানি হামাগুড়ি দিয়ে হারিয়ে
যেতে যেতে একদৃষ্টে দেখে—নির্জনতার সঙ্গে গল্প করছেন বাবা,
হাজার হাজার চুলের অন্ধকারে ঠাকুমা একটা গাছ হয়ে যাচ্ছেন...

সম্পর্কের অন্ধকার জীবন—১

এ শহরের দিনেমার গির্জা আমায় শুভসকাল ডাকে
আমি তার প্রিয় সম্পর্কদের ডেকে বলি
বাইবেল মনগুলি আমার বাড়ির চারপাশে সাজাতে।
তারা সন্ধ্যায় একটা মোমবাতিকে আমার দরোজায় বসিয়ে
চলে যায়। আমার ঠাকুরদার শখের বাতিদান গেয়ে ওঠে
দরবারি, সারা দেহ কেঁদে ওঠে। প্রতি অশ্রুগায়
বিচ্ছেদের সুর, মাথার ভিতর প্রবাল চরে নিঃসঙ্গ ঢেউজীবন।
অভিসারের প্রস্তাব নিয়ে একটা পরি উড়ে এলে
শহরের প্রবেশদ্বারের মুখ যায় ঘুরে। নদীর বুকে শুয়ে থাকা
অন্তর্বাসহীন আহ্লাদ হেসে গলে জোছনা হয়ে যায়,
শহরের নাভীকুণ্ডে মহানাগরিক বাতিস্তন্ত দেখে ক্ষমাশীল গাছেরা
সম্পর্কের অন্ধকার জীবন নিয়ে কথা বলছে প্রবীণ গির্জার সঙ্গে

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

নেড়েচেড়ে রেখে দিই
নেড়েচেড়ে রেখে দিই, কখন অজান্তে বুকের উপর
দেখি সহাস্য পর্বত জেগে আছে
প্রতিদিন মাথার ভিতর একটু একটু করে নেভে লণ্ঠনের দীপ
কাকে যেন খুন করে টাঙিয়ে রেখেছ চাঁদে
কাঁটাগাছ
জং—ধরা বর্শাফলক
প্রতিবার ভেঙে গেছে আঘাতের কালে

বিশ্বাস করুন
আবারও বলছি বিশ্বাস করুন, আমি দেওয়াল ধরে দাঁড়াব না
রাস্তায়
আপনি যতই বাটি ধরান, কনডোম ধরান, আমি একা একা হেঁটে যাব
আমি একা একা ফিরে আসব, এসে বলব—
এখনও প্রদীপ জ্বালানি সন্ধ্যায়
ব্রেকিং নিউজে আমাকে দেখাচ্ছে, চ্যানেল ঘুরিয়ে দেখো
বাসের চাকার তলার থেকে উঠে আসছে আমার আধখানা দেহ আর
হাততালি দিচ্ছে
ভুলে যাও যেটুকু মিশে আছে রাস্তায়, পিচের ভিতর
যে আধখানা আপোশ করেছে, গোপনে বাড়িয়ে দিয়েছে হাত
নির্বিবাদ সংসার করেছে দেখো তার বাজারের ব্যাগের ভিতর
আমার কাটা মুণ্ডু, রান্নাঘর থেকে সটান উঠে আসছে খাবার টেবিলে
বিশ্বাস করুন দেওয়াল আমি ভেঙে দেব বলে প্রতিদিন
আধখানা জেগে উঠি ঘুমের ভিতর

শৈলেন কুমার দত্ত

যাত্রা

ধরা যাক যন্ত্রণা নেই! অনিবার করুণ হাত
পাঠিয়েছে সাদর আহ্বান...কিছু কিছু ভুলত্রুটি
নিজেরাই হেঁটে গেছে মোহনার দিকে

অমলিন পটজুড়ে গাঢ়বর্ণ নিটোল চিবুক
কিছু তার তপ্ত স্বাদ...নাগালে মসনদ আর
আমি তৈরি সেই সাজে যা আসলে তুমুল উৎসব

যাত্রা শুরুর আগে তোমরা সকলে দিয়ো অটেল উৎসাহ...

অবিনশ্বর

একে একে সব আলো নিভে গেলে জেগে থাকে অন্ধকার। মধ্যে
একটিমাত্র আলোকবর্তিকা তার সূচ্যগ্র অর্ন্তভেদী দৃষ্টিতে
ধ্বংস হতে পারে চরাচর...সেই আগুন নিয়ে আমি খেলা করি...
তখন মধ্যরাত্রি ওই আলোকশিখা আমাকে স্বর্গ দেখায় নরক
চেনায় আর ভূতযোনি পাত্রজুড়ে পান করায় অমৃতসুধা
এমন আহ্লাদ আমি আগে কখনো পাইনি...হে রহস্যময়ী
কবিতাসুন্দরী তুমি আমাকে ওই আলোকশিখা স্পর্শ করতে দাও
কেননা আমি কখনো অবিনশ্বর হতে চাইনি...

ফলশ্রুতি

স্থিরচিত্রে তুলে রাখা ধূসর গোধূলি...নরম অতীত তার!
বহু দূরে বাড়িয়েছি পা...সেখানে অযোধ্যাজুড়ে উৎসবের রাত
আগন্তুক আমি শুধু কুড়িয়েছি বিরল নমুনা

সুতীক্শন গম্বুজে তার বিদ্ধ রাখা অলৌকিক মুখ
অস্পষ্ট কালোর ছাঁদে মিশে আছে অতলান্ত হিম
প্রান্তরে সবুজ ঘাস চিহ্নিত করেনি কোনো যুগ
আমি সেই দুঃসাহস জমিয়েছি অমল সুষমা

খুঁজে দেখো সারা দেহে বলিরেখা নেই!
আমাদের বয়স বাড়ে না...

আসর
ভূমধ্যসাগর ঠিক পৃথিবীর মাঝখানে...এপাশে আঙুর খেত
ওপারে বল্লমধারী আদিম যোদ্ধারা! আমি যেই চুপিচুপি
পার হই সুয়েজ প্রণালী...পিরামিড কথা বলে
গুনগুন ধ্বনি তার জমা হয় মর্মর সাগরে!

বসরাই ফুল হাতে আমি গাঁথি জীবন্ত প্রহর
হিমেল ঝড়ের রোষ তখনও থামেনি উত্তরে
সারা গায়ে ক্রোধ মেখে রাসপুটিন নামে
হিংস্র দু—হাতে তার সোহাগ লুকোনো!

আমাজন থেকে তাকে এনে দেব বাঁশি
নৈঋতে তোমরা শুধু আসর সাজিও...

সঞ্চারী গোস্বামী

ব্রতকথা

তুমুল প্রশ্নবাণে পরাভূত করেছি তোমাকে।

জ্ঞানের স্পর্শের মতো ভেজাভেজা ভাব আর নেই
মুছে গেছে লক্ষ্মীছাপ—হাওয়া আর সময়ে শুকিয়ে
আংটির খাঁজে খাঁজে ধুলো জমে ওজনে বেড়েছে;
সাবান ও জলের দাগ পা ছড়িয়ে বসেছে রোয়াকে—

দেওয়ালের রং খসে বিষাদ ছোঁয়ানো বন্দিশে
আধচেনা সুর হয়ে বেঁচে থাকে নিষেধের চিঠি—
সদ্য ফোটা ছাতিমের গন্ধ তবু বেসামাল হয়
সাররাত খুঁজে ফেরে কে প্রথম বলেছিল তাকে

জীবন মানে তো আর শুধু প্রশ্ন—প্রশ্নবাণ নয়—

পথ

নাম ধরে ডাকলেই সাড়া পাব
এই বিশ্বাসে
অনেক হেঁটেছি পথ;
ঠিক কোনো ঠিকানা ছিল না।
অস্পষ্ট আলোর রেখা, শূন্যকোনো নদীর ধার ধরে
জমানো মেঘের থেকে ঝরে পড়া দীর্ঘশ্বাস মেখে
বয়স পেরিয়ে আসি—
ফিরে আসি বয়সের কাছে।

এখানেই ভিটেমাটি, এখানে উঠোন—আলপনা
সবই রয়েছে—
জানলা খোলাই আছে, দরজা রয়েছে।

একেই তো বাড়ি বলে
সাজানো বাগান খুলে রাখি—
অদৃশ্য চৌকাঠ থেকে ভেসে আসে সব ডাকনাম
হেঁটে যেতে ইচ্ছে নেই
উড়ে উড়ে যেতে যেতে দেখি—
ঘরজুড়ে পড়ে আছে পথ।

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যবিত্ত বিভ্রান্তি

মানুষকে তার অগোচরে মূল ঠিকানায় নিয়ে যেতে প্ররোচনা দিচ্ছে
দেখে সম্ভবত শেষবার ক্ষুধিত মেধায় উঠে দাঁড়াতে চাইলাম

নেহাতই জন্মদোষে আমার কোনো অগ্রজ নেই বলে পেছনে তাকাবারও
কিছু নেই। শুধু অনুজের দাবিপত্রগুলি যথা স্থানে লক্ষ্যভেদ
করে যাচ্ছে দেখতে দেখতে বুঝতে পারি আমার সামান্য দাবির
ছিন্নপত্রাংশ আকাশে ভেসে যাচ্ছে বাতাসে তুলোর বীজ হয়ে।
অহো পথ ভুল আবেগ আমার! সত্যি এ বয়সে...ভাবলে হাসি পায়,
আজ প্রায় এতটাই সময়ের ব্যবধান হয়ে গেল।

এর পরও এল.আই.সি.—র দালালকে জিজ্ঞেস করেছি, অন্য শহরতলীর
দিকে এক ফালি জমির কী দরদাম? সমস্যা ওই একটাই, একটুখানি শেকড়
চাই—শেকড়। যেন ওই শেকড় আমায় অলৌকিক বারাদ্রনার আশনাই
থেকে মহাসতীর কুঞ্জবনে পরমার্থ সন্ধান দেবে...

কল্পনায়ও যেহেতু কোনোদিন চড়িনি কনকর্ড, স্বপ্নের মধ্যে তাই
অপার্থিব রানওয়ে...অলীক এ্যারোড্রাম—আমাকে রোজ ভোরে
বমি করছে শিয়ালদা সাউথ সেকশনে।

ভয় পাই, অকারণেই বড়ো ভয় পেয়ে যাই। যদি দেখি চেনাজানা
কেউ জোরে দৌড়োচ্ছে তো প্রাথমিক ঈর্ষা কাটিয়ে পরক্ষণে খুব
সিঁটিয়ে যাই—ইস! যদি হোঁচট খায়! কিন্তু আমার তাতে কী!
তবু চরিত্রের ওই এক দোষ রে ভীরা মধ্যবিত্ততা...এত ঠেক খেয়েও
মিশতে মিশতে ফের কেন যে মানুষের ল্যাঞ্জে জড়িয়ে যাই...

পাখি

তোমার দেয়া দুঃখ স্থির বিদ্যুতের মতো উদ্যত

আমার জন্যে

অথচ বয়স বাড়ছে তো ভেঙে যাচ্ছে

ভুল ইচ্ছাগুলি বরফচুরের মতো

সুখ—দুঃখের বাষ্প জমানো থ—মণ্ডলের

অনেক উঁচুতে নিজেকে জানার স্তরে

উড়ে যাচ্ছে ওই পাখি

সত্যের প্রথর আঁচে ডানা থেকে ঝরে পড়ছে

মায়ার পালক...

তোমার মলিন অপমান

আজ আর আমাকে ছুঁতে পারে না—

ছায়া অধিকার

সেই প্রেম তবু ভালো ছিল—এক রাজকন্যা,

যার ঘরে যেতে পথে অজস্র প্রহরী

অথচ এখন তো কিছু নয়, সহজলভ্য সব,

অধরা রইল না বলে মাধুরী হারিয়ে গেল

বাঁধের ওপর দিয়ে হাওয়ায় ওড়ে চুল

ওড়ে ধুলোবালি, জলরঙ নদী

নীচে স্থির স্বচ্ছ রেখা,

আকাশে দোয়েল ঝাঁকের পিছনে ধাবন্ত বাজ

ভয়—ছবি—গতি, অশান্ত নীলিমায়...

কিছু নেই—নেই,

মানাতে পারি না এই অসমান বেঁচে থাকা

শুধু চোখ মেলে রাখা—যেন মধ্যদিন

ঝুঁকে দেখি সেতুর তলায় জলে কত

ছায়া অধিকার।

সিদ্ধার্থ সান্যাল

তুমি ১

যেভাবেই সাজাই চিত্রকল্প
তুমি এসে যাও।

আমি ঘর সাজাই
ঘরের ভিতরে থাকে আলো
বাইরে আকাশ
আর ঘরের বাতাস কেমন মলয়সমীরণ
তুমি এসে দাঁড়াও দুরারে।

যেভাবেই আঁকি দৃশ্যমালা
তুমিই থাকো রেখায় রেখায়।।

তুমি ২

মুমূর্ষু রক্তিম সূর্য ছিল না তোমার পিছনে
তবুও অপরূপ মায়াবীর মতো
তুমি এসেছিলে।
তোমার হলুদ আঁচলে ঠিকরে গিয়েছিল
বিকেলের কনে দেখা আলো।

তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম
স্বপ্ন এড়িয়ে গেলাম
শিরিষের মাথায় সূর্য অস্ত গেল
এবারের মতো।।

সুতপা দাশগুপ্ত

অভিমুখ

বিভাজিকা চৌকাঠে অনন্ত রোদ
ঠোঁটে ঠোঁট রাখতেই চুম্বন অনিশেষ
বুকজুড়ে তোলপাড় প্রেমিক অক্ষর...
তুমি আড়চোখে দেখে নিলে বিভঙ্গ
একটু হতাশ—এ ঠোঁটে তখন সিগারেট
বোবাচোখে কী আর সাজানোর থাকে।
তখন জল অনন্ত...এক রেখা তরঙ্গ উথালপাথাল
হঠাৎই ফোয়ারা বিচ্ছিন্ন উচ্ছলতা থেকে
নিঃশেষ জাদুবাস্তবের পেয়ালা মগ্ন নির্মাণ।
কথা নয়—ওরা ভালোবাসা চেয়েছিল আগুনের কাছে
ওকে তো ঠিকানা দেবে—
ওরা খুঁজছিল উত্তাপ নিবিড়তা স্পর্শ অসুখ
ওকে তুমি বাতাসের হাহাকার নয়,
পরিব্রাণ নয়, ওকে দিও নম্র অভিমুখ
শুরু হোক হৃদয় তোলপাড়—

দোয়েলপাখি খাম

এ শহরে পড়ে আছে শ্বাস
মুহূর্তের কাছে জমা আছে ঋণ
আমি ফিরছি নির্জনতম ব্যস্ততার কাছে
ফিরি না শুধুই নিজেকে ফেরাই
বুকের প্রকোষ্ঠে জমা আর্দ্র চিঠি ঠিকানাহীন
অনেক বছর আগের এক ভোর
এলোমেলো দিন, মতিচ্ছন্ন হাওয়া আর পুরোনো ডাকনাম
একটি শব্দ সর্বনাশা—লিখিনি কোনোদিন
হঠাৎ করে বছর ঘুরে অন্য আরেক দিন
নদীর জল, শুকনো পাতা, অন্য সাকিন।

ওরা জানে আমি চুপ করলেই নির্জনতাও হার মানে
ভিতরে ভিতরে বয় নদী, উন্মুক্ত জলোচ্ছ্বাস
ভাসে না শুধুই আমাকে ভাসায়—
তবুও ফেরো কৃষ্ণচূড়ার কাছে
দ্রয়ার খুলে আঙুল ছুঁয়ে দেখো
নীচের খোপে আর্দ্র চিঠি, আস্ত একটা সুনীল আকাশ
আর...
পড়ে আছে দোয়েলপাখি খাম।

সুশোভন অধিকারী

অশ্রু

যে অশ্রু স্থির, টলটল, হয় না বানভাসি কখনো
হাজার জোয়ারেও...
দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় চকিতে—
আসলে লুকিয়ে পড়ে পর্দার আড়ালে, অভিমানে—
লুকোতে বাধ্য হয়...
জেনো তার দাম
সমপরিমাণ...

হোস্টেল

হোস্টেলের এই ডাবল সিটেড ঘরে
এখনও থাকতে হবে বেশ কিছুদিন
তারপর দেখা যাক কে সিট ছাড়ে আগে...
এখনও নস্টালজিক ওই পেনস্ট্যান্ড,
টেবিল ক্লথ, ধূলিকণা সমৃদ্ধ, মাঝে ক্ষত,
হয়তো উল্কাপিণ্ড
রেখে গেছে তার আগুন ঝরা কিছু তানিয়া সৌরভ
এখনও রাখা আছে ধূসর পালক
মৃত চডুই পাখিটার কবিতা গ্রন্থের ভিতর
পাথার ব্লেডে পাওয়া যাবে তার ডানার দাগ
যদি খোঁজো...
দ্যাখো পলেন্স্তারাটি খসেছে দেওয়ালে
যেন স্যাটেলাইট...
ভাসছে বিছানায় দুটি রাজকীয় দূরত্বে
ক্রমবর্ধমান এই অনন্তে...

সুহাস মুখোপাধ্যায়

শৈত্য ঝলক

দূর যাত্রা, গ্রীষ্মের মহাকাশ, সবুজ গ্রহের ফের
নীলাভ সবুজ যান; তাবৎ ভূসম্পদ সম্পর্কের
ঢেলাপিছু কানাকড়ি; এখন ভাঁটার সময়;
কসমস জড়ানো কিছু তুচ্ছ মান,
অসফল অবশেষ; প্রতিবেশী; প্রেতের
অবয়ব প্রায় ক্ষীণ, ম্রিয়মান, দুঃখী, ছোবলে কাতর;
তোমারও তো চেনা; তবু ছায়া—মনে পড়ে কোনো
একদিন, হাতছানি দুর্বিপাক শেষে
যেন শৈত্য ঝলক এক হাওয়া

ক্রমশ শিল্প

আলো, অস্পষ্ট শিল্প; সূচিমুখে আশ্চর্য বয়ন
মেঘ যেন সতেজ বিটপী
জলপ্রপাত, শৈবলিনী, লতা, ফুল, পাখি,
বাসা বদলের এই পথ সময়ের

ঘুমিয়ে পড়েছে; ছড়ানো রঙিন সুতো
অন্ধকারে ক্লান্ত ঈষৎ স্ফুরিত

পূবের আকাশ ত্রস্ত; দাউ দাউ
অবাক চাহনি, ওঠে ঘুম ভাঙা

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

আমার পূর্বপুরুষ

নদীবক্ষে অবিরাম সাইকেল চালনা—মুদ্রণশ্রমাদে এই পঙক্তি পাঠকালে
আমার মনে পড়ে যায় উর্ধ্বতন পঞ্চমপুরুষ রামসনাতন উপাধ্যায়ের কথা
বাবার কাছে শুনেছি তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ এবং হেঁটে পার হতে পারতেন
কাশীর গঙ্গা

আমার ছোটোবেলা ছিল বিরামহীন শূন্যে ঝাঁপ
মায়ের ছিল মুক্তবেনির মতো একরাশ দুঃখ
অভিমানী ও একগুঁয়ে মেজদি চিরকুমারীই থেকে গেল
রাগি ও রেসকোর্সপ্রিয় মেজদাকে দেখে কে বলবে ইনি এককালে সেতার
বাজাতেন

বড়দা ভীষণ বাতিকগ্রস্ত, বড়োবউদিরও শুচিবাই
বড়দির সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নাই
ভাইপো ও ভাগ্নের মুখ পাথরের মলাট দেয়া
আমার ছেলেরা জানে না এলাহাবাদে তাদের পিসতুতো দিদি ও দাদা আছে

আমি সিদ্ধপুরুষ রামসনাতনের কাল্পনিক ছবিটা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করি
আরে, এ যে দেখি অ্যাসাইলামের ডাক্তারের বিকট সহাস্যবদন!

খুশিমতো পদ্য

কুড়ুল দিয়ে ফিতে ছিঁড়ে চালু করব পরশুরামের পূজো
অল্লীল পুস্তকগুলি জ্বালিয়ে দেখব
কতখানি পবিত্র আগুন
শহরের দেয়ালজুড়ে লিখব প্রেমের কবিতা হাহাকার
খুশিমতো পদ্যগুচ্ছ ছাপাব পাঁজির পাতায়

বেশ করব 'পৃথিবী' বানানে আমি দীর্ঘ—ঈ দেব না

মফস্বলের কবি

দু—হাতে ডানা ঝাপটাও কবি, প্রতিকূল হাওয়া কেটে উড়ে যাও
চুল্লির ধোঁয়া, হাওড়া ব্রিজ ছাড়িয়ে ওপার আকাশে—
তুমি ধরা দিতে চাও না, কেননা ধরা পড়লেই
তোমায় আটকে দেবে রক্তাক্ত পেরেক, হিংসুটে চুষক, জ্বীর গদ্য ঝংকার
বন্ধু ভাবো যাকে তুমি সে তোমার পালক ছেঁড়ায় আগ্রহী
তারা জামার আস্তিনে মুখ ঢাকে তোমার উড়ন্ত ভঙ্গিমা দেখে
তোমার খিদে পেলে খাবারের বদলে এগিয়ে দেয় চারমিনার
চাঁচিয়ে কাটতে বলে ট্রামের টিকিট, আর তুমি
পকেটের খুচরো পয়সা মনে রেখে বিবর্ণ হাসো, ইয়ারকি করতে বারণ করো

কবি তুমি, কত শব্দ জানো অথচ সকলের কাছেই যেন জন্মঅপরাধী
গুছিয়ে বলতে পারে না, বউ গঞ্জনা দেয়—বড়ো কবি হওনি—
মানে টাকাকড়ি পুরস্কার পাওনি কখনো
আমার কষ্ট হয় তোমার লজ্জার শশকভঙ্গিমা দেখে
জানি, তোমার বউকে কলকাতার আলো ও থিয়েটার দেখাতে না পারার
বেদনা আছে, ছেলের ওভালটিনের বদলে কেনো পাঁচ পয়সার
কোকো—চকোলেট
বিচুটির মতো হাসির বিষ ছড়িয়ে পাওনাদার বন্ধু ডাকে, এই যে কবি,
আর কদিন?
খাটের নীচে ভাঙা হারমোনিয়াম দেখে বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলো সংগীতস্মৃতির—
তুমি মফস্বলে থাকো, ট্রেনের মাস্তুলি ধার নাও—কলকাতা তোমায় টানে
অথচ কেউ চেনে না তোমায়, রোগা কালো বসন্ত দাগ মুখে, মনোকষ্টে
দু—হাতের বদলে ডানা ঝাপটাও, হাওয়া কেটে চলে যাও দিগন্ত ছাড়িয়ে
স্বপ্নে গাঁথো অক্ষরবৃত্তের প্রাসাদ
পুরোনো লিপির পাশে জমে ওঠে অপমান অভিমান জ্বীর ছলোছলো চুমু
সে তোমাকে সত্যিই ছোটো করতে চায় না, কবিতা বোঝে না সে,
বোঝে তোমাকেই
তবু তুমি, কবি ছাড়া কিছু হতে চাওনি—
আমি বিস্ময়ে তোমার উড়ন্ত ভঙ্গিমা দেখি

প্রেমিকের সবটুকু নেয়
ফুলেরা ভ্রমর ভালোবাসে কুঁড়ি থেকে
চিনে রাখে তাকে
অর্থাৎ দস্যুর কাছে লুণ্ঠিত হবার বাসনা জাগিয়ে রেখে
পুষ্পের বিকাশ হয় গন্ধে পর্ণে হলুদ কৌমার্যে
তাদের বুকের মাঝে রাজপাট আছে
যেমন একটি নারী চাবির গোছাটি দিয়ে এ সংসারের
অনেক দরজা খোলে বাক্স আলমারি—সে সবই
মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ফুলেরা যেমন ভ্রমরের থেকে
প্রত্যহ চুষন
প্রত্যেক নারীই তার গুঁড় মন্ত্রে প্রেমিকের সবটুকু নেয়

কেমন আছ, ভালো?
হিসেব রেখেছি ঠিক, আমার গোপন খাতা ভরে আছে
সুখদুঃখ কাঁটা
পুজোয় প্রথম শাড়ি কবে পড়েছিলে, ওষ্ঠের মিতালি
গ্রামে যেতে কেঁদেছিলে দীর্ঘদিন দেখা তো হবে না
সে চমক মনে আছে? দু—দিন পরেই আমি হঠাৎ হাজির
হিসেব রেখেছি সব শাদা—কালো অক্ষরের ছবি আঁকা
নির্মল বসুর নাম কতবার করেছিলে রাগাতে আমায়
মনে কি সেসব পড়ে আজও এই রাতে
লাল খাতা...শাঁখা ও সিঁদুর...পিঁড়ির আলপনাখানি

তোমার ছেলে ও মেয়ে, ভালো আছে? কী নাম তাদের?

সৌরভ দত্ত

প্রেম

১

উত্তজনারা লিখে রাখে যেই কাব্য
সেখানে ঠোঁটের আদরে ভেসেছে বিশ্ব

রসায়ন সব গভীরতা মাপে নিয়মে
সমস্ত প্রেম মনকে পুড়িয়ে নিঃস্ব

২

কৃষ্ণচূড়া পাঁজর ছুঁলে দেখি
কান্নার রং জলের মতো নয়

শিমুল আদর একটু যদি মাখি
বুকে ছড়ায় মনখারাপের ভয়

৩

সময় মেনে ভাঙতে থাকি রোজ
ভাঙার জন্য দাঁড়িয়ে আছে কাল

প্রেমের দু—হাত একটু ছুঁয়ে দেখি
ছুঁয়ে পড়ে পলাশ ভাঙা লাল

৪

শুধু স্পর্শটুকু ছাড়া দিইনি কিছুই
তুমি গভীরে গেঁথে নিয়েছ প্রেম
আমার স্পর্শ বোহেমিয়ান হলে
মনে কোরো ফাগুন আমায় ছুঁয়েছিল সেই মুহূর্তে

Table of Contents

Title Page	1
Copyright Page	2
Dedication Page	3
ভূমিকায় দু'চাৰ কথা	4
নিবেদন	5
'কবিতা শ্ৰীৰামপুৰ' — প্ৰথম সংকলন (১৯৯৫) সম্পৰ্কে সমসাময়িক পত্ৰ — পত্ৰিকাৰ মতামত	7
সূচি	10
অদ্বীশ বিশ্বাস	13
অনিলেশ গোস্বামী	14
অসীমেশ গোস্বামী	16
কল্পৰ্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়	18
কেশব বণিক	20
গৌতম মজুমদাৰ	22
গৌতম সরকার	24
চিত্ৰা লাহিড়ী	25
দত্তা	27
দীপক লাহিড়ী	29
দীপশংকৰ ৰায়	31
দেব গঙ্গোপাধ্যায়	32
দেবজিৎ দে	33
দেবনাথ মুখোপাধ্যায়	34
দেবাশিস চক্ৰবৰ্তী	35
দেবাশিস মল্লিক	36
ধ্ৰুব বাগচী	37
ধ্ৰুবন সরকার	38
নন্দিতা সিনহা	39
পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়	41
প্ৰণব বসু ৰায়	42

প্রবণপালন চট্টোপাধ্যায়	43
প্রদীপ দাস	45
প্রশান্ত ঘোষ	46
বহ্নিশিখা ঘটক	47
বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	48
বোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায়	49
মুকুল বসু	50
মৃদুল দাশগুপ্ত	52
মহুয়া চৌধুরী	54
মেখলা সেন	57
রথীন বণিক	58
রমা ঘোষ	60
রামকিশোর ভট্টাচার্য	62
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়	64
শৈলেন কুমার দত্ত	65
সঞ্চারী গোস্বামী	67
সমর বন্দ্যোপাধ্যায়	69
সিদ্ধার্থ সান্যাল	71
সুতপা দাশগুপ্ত	72
সুশোভন অধিকারী	74
সুহাস মুখোপাধ্যায়	75
সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	76
সৌরভ দত্ত	79